নরক পেরিয়ে

দীপককুমার দত্ত

এস. দাস এণ্ড কোং
৩৭/৬ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬৪

প্রকাশক :
এস. দাস
৩৭/৬ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
রাজেন চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
জে. মাইতি
লিপিমুদ্রণ
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

পিতৃদেব শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দত্ত
পরম ভক্তিভাজনেষু—

সারা আকাশে একটা ক্লান্তি মেলে দিয়ে বলাকার মালা ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কৌশিক ওর চলে-যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজে ফিরতে লাগলো।

বিকেলের গ্রাম।

শেষ সূর্যের ধূসর রাঙা আলো আম-জাম-কাঁঠালের বনের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। পায়ে-হাঁটা মেটে রাস্তার পাশের বিরাট তালগাছ-টার পাতায় দিনশেষের আলো পরম সোহাগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাতার উপর আলোর রেখাগুলো বুঝি স্পন্দিত।

প্রথম হেমন্তের এই ম্লান কোমল বিকেলটা অবসন্নতার মধ্যেও বেশ লাগছে কৌশিকের। তার শীর্ণ চোখ দুটো খুশি হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

আম-জাম-কাঁঠাল বনের পাশে ছায়াভরা একটি পুকুর। বেশ বড়ো পুকুর। কে যেন ছিপ ফেলে বসে আছে চুপচাপ।

কৌশিকের খুব ভালো লাগছে ছায়াছন্ন শান্ত নিস্তরংগ পুকুরটার দিকে তাকাতে। ······কতদিন পুকুরের জলে পড়ে থেকেছি। শিশুর মতোই দাপদাপি করেছি, উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে অবিরাম জল ছিটিয়েছি। কখনো মাথাটা জলের উপর জাগিয়ে রেখে আপন মনে গুনগুন করে গান করেছি। শালুকফুল তুলেছি ইচ্ছেমতো। আপন মনে নখ দিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়েছেও সেসব, আবার ভাসিয়ে দিয়েছি। কখনো ধরে নিয়ে এসেছি দু-একটি ফুল।

কৌশিকের দুর্বল শীর্ণ দেহ ইজি-চেয়ারের কোমল উষ্ণতার মাঝে একবার নড়ে উঠলো। —একবার উঠে পুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালে

কেমন হয়! প্রতিটি রক্তবিন্দুকে উচ্ছল করে তুলবার জন্যে একবার ওখানে গেলে হয়!

তালগাছের মাথা থেকে রাঙা আলোর রেখাগুলো বুঝি বেদনা নিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। মাঠ থেকে ফেরা গবাদি পশু শূন্যে যে ধুলোর কুণ্ডলী সৃষ্টি করেছিলো তা কখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মিলিয়ে গেছে।

পুকুরের পাড়ের কাশবন মৃদু বাতাসে শির শির করে কাঁপছে। জলের বুকেও মৃদু বাতাসের স্পর্শ।

কৌশিকের বুকের মধ্যেও কেমন শির-শিরানি শুরু হয়ে গেছে।

আবছা আঁধার নামছে পুকুরটাকে ঘিরে।

কৌশিকের দৃষ্টি সেদিকে স্থির হলো।

......কৌশিক হাত-পা শিথিল করে দিচ্ছে।

—আঃ! কী তৃপ্তি, কী আরাম! স্নিগ্ধ জলের স্পর্শে দেহের ক্লান্তি দুর্বলতা দূর হয়ে যাচ্ছে। উদ্দাম উন্মত্ত হয়ে জলের মধ্যে পাক খাচ্ছে সে। পুকুরের অটল নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেছে।

পাড়ের কাশবনও উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

এবার ডুবছে সে......ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে জলের গভীরে। হাত-পা সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ আড়ষ্ট অসাড় হয়ে যাচ্ছে। জলের উপরে জেগে উঠবার কোন চেষ্টাই নেই। ......চোখের সামনে ছায়া-ছায়া মূর্তি। কেমন এক ধরণের উদাস ঔজ্জ্বল্য জলের অনুতে অনুতে। একটা কঠিন নিস্তব্ধতা, একটা তীক্ষ্ম শান্তি বিদ্ধ করছে সারা দেহ। ...... সামনে ওটা কী? কী হতে পারে? ভাবতে চেষ্টা করলো। —মৃত্যু! মৃত্যুই কী অমন সুন্দর মোহন বিপুল এক অন্ধকারের রূপ ধরেছে! এবার একটা যন্ত্রণা। কিন্তু কী আশ্চর্য, যন্ত্রণা তো তাকে কাতর করছে না! মৃত্যুর রূপ, মৃত্যুর ভাব, মৃত্যুর প্রভাব কী এই রকম! মৃত্যুটা হয়তো যন্ত্রণার বিলাস। কিংবা মহাসুন্দর বা অতিভয়ংকর মহিমাময় একটা উত্তরণও হতে পারে। নিঃসীম গভীর অন্ধকারে বেহালার গভীর পরজের সুর যেমন করে মানুষের মর্মকে রঙিন করে তুলে মানুষকে

হন্নছাড়া করে তেমনি ঘন সুরের বিচিত্র প্রবাহ তার সত্তার গহনে এখন অবিরাম বাজছে। —বাজছে—বাজছে—বাজছে। কেবলি বাজছে।

এতক্ষণে সে বুঝলো—তার মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুপূর্ব জীবনের সমস্ত সম্পদ হারিয়ে এখন সে এক আশ্চর্য মহিমময় রাজ্যের অধিবাসী। চঞ্চলতা ঐশ্বর্য হয়ে চারিদিকে বিস্তৃত। একটা অবারিত অমিত্রাক্ষর গতি। কোন যন্ত্রণা নেই, সামান্য সুখ নেই। শুধুই আনন্দ—এক রোমাঞ্চকর তৃপ্তি। পার্থিব নিষ্ঠুরতা অচলতা অবজ্ঞার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।······

নিঃসীম মুক্তির রাজ্যে সে এখন গতি হয়ে জন্ম নিয়েছে। শুধু গতি নয়, একটা অপরূপ সৌন্দর্য হয়েও সে বিরাজ করছে।······

হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া পৃথিবীর প্রধান ঘটনা—নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এখানে শুধু গতি হয়ে, অপরূপ সৌন্দর্য হয়ে অনন্তকাল জেগে থাকা। এখানে প্রতি মুহূর্তে নতুন হয়ে ওঠা।···

মৃত্যুপূর্বে জীবনের কথা ভাবতে চেষ্টা করলো সে। পার্থিব জীবনে সে কী ছিলো? তার কী ছিলো? মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র অন্য কোনো প্রিয়জন ছিলো কী? হয়তো ছিলো। হয়তো তার রূপসী সুদর্শনা স্ত্রী তাকে আদরে সোহাগে ভরে তুলত। সীমার মধ্যে বদ্ধ করে কেবলি হয়তো সুখ-সুখ খেলা করত। হয়তো তার মন যন্ত্রণায় ছটফট করত। কিংবা মোহমুগ্ধ হত। মা-বাবা, অন্যান্য প্রিয়জনের সংগে তার সম্বন্ধের ধরণটার মধ্যে বৈচিত্র্য ছিলো কা? নাঃ, কিছু মনে পড়ছে না পার্থিব জীবনের কথা। তবে এটুকু বুঝতে পারছে—সে জীবনে উদ্বেগ ছিলো, চঞ্চলতা ছিলো না। সেখানে এক অটল শান্তির মধ্যে স্থির হয়ে গিয়েছিলো।······সে চলেছে। চঞ্চলতার অতলান্ত গভীরে কেবলি চলেছে—চলেছে। নিঃসীম চলার মধ্যে, নিঃশব্দ ব্যাকুল মুখরতার মধ্যে কত সহজে সে মিলিয়ে যাচ্ছে। —আঃ!···

—কী রে! অমন উঃ—আঃ শব্দ করছিস কেন? ঘরে চল্। ঠাণ্ডা লেগে আবার শরীর খারাপ করতে পারে।

ইজিচেয়ারের মধ্যে কৌশিকের শরীরটা থর থর কেঁপে উঠলো। ধীরে ধীরে চোখ মেললো। তারপর কেমন হতভম্বের মতো বসে রইলো।

—কী হলো! শরীর ভালো আছে তো? একটি স্নেহভরা কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ঝরে পড়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসলো কৌশিক।

চারিদিকে অন্ধকার নেমেছে। পুকুরটাও অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। ওর জলের উপর নিথর শব্দহীন অন্ধকার জমাট হয়ে নামছে বুঝি।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে! সর সর শব্দ উঠছে তালগাছের পাতায়। আকাশে তারা ফুটেছে। অনেক তারা।

গুঞ্জন করতে করতে অন্ধকার পথ দিয়ে কয়েকজন লোক চলেছে। কোথায় একটা কুকুর ডাকছে। কোনো গাছ থেকে পাখির পাখার শব্দ ভেসে এলো।

একটা শান্ত স্নেহমাখা হাতের স্পর্শ মাথার উপর অনুভব করলো কৌশিক। বুঝলো পিসিমা এসে দাঁড়িয়েছেন। পিসিমার হাতের স্পর্শ বেশ ভালো লাগছে। পিসিমা বললেন, ঘরে চল্। অসুস্থ শরীরে বাইরে না থাকাই ভালো।

—বেশ আছি পিসিমা। জোরে নিশ্বাস নিয়ে কৌশিক বললো, এমন কিছু ঠাণ্ডা পড়েনি। বাইরে বেশ লাগছে। মৃদু হাসলো সে।

পিসিমা ঘরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন একটা কম্বল নিয়ে।

—কম্বল! বিরাট একটা হাসির বেগকে জোর করে চাপলো কৌশিক। বুঝলো—পিসিমার সারামুখে একটা সস্নেহ কাতরতা।

পিসিমা কম্বলটা দিয়ে তার গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। —এবার থাক্। যতক্ষণ ইচ্ছে বসে থাক্। এতক্ষণ পরে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন পিসিমা।

অন্ধকারে পিসিমার মুখ দেখতে চেষ্টা করলো কৌশিক।

বেঞ্চির উপর বসলেন পিসিমা।

দুজনেই চুপচাপ।

আকাশভরে তারা উঠেছে।

গাছের পাতায় পাতায় শব্দ উঠছে শন্ শন্ সর্ সর্।

একটা কুকুর ছুটতে ছুটতে চলে গেলো।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো কৌশিক। অন্ধকার চেপে বসেছে পুকুরটার উপরে। ঘন জমাট অন্ধকার। পুকুরের পাড়ের কাশবন নিশ্চয়ই হাওয়ায় কাঁপছে। পুকুরের জলেও হয়তো স্পন্দন দেখা দিয়েছে।

পুকুরটা কী তাকে ডাকছে? পুকুরের ঠাণ্ডা জলের কোনো শব্দ তার কানে এসে পৌঁছচ্ছে কী?

—বৌমা আজ চিঠি লিখেছেন। পিসিমা স্তব্ধতা ভাঙ্গলেন।

পুকুরের জলের গভীরে একটা তীক্ষ্ম শান্তি, একটা কঠিন নিস্তব্ধতা সর্বক্ষণের জন্যেই কী জেগে থাকে। কৌশিক ভাবলো—কী অদ্ভুত কল্পনাই না তাকে পেয়ে বসেছিলো! —মৃত্যুর সত্যিকার রূপ কী? মৃত্যু কী মানুষকে নিঃস্ব ঐতিহ্য অথবা অনন্ত ঐশ্বর্যের মাঝে আকর্ষণ করে? —একদিন পুকুরের জলে অনেকক্ষণ ডুবে পরীক্ষা করতে হবে।

শব্দ করে হেসে ফেললো কৌশিক।

—তোর কী হলো বল্ দেখি! পিসিমার কণ্ঠস্বরে আশংকা। জ্বর-টর আবার এলো কী! আজ সকালবেলা তো বেশ ছিলি, কিন্তু বিকেল থেকে তোর পরিবর্তন দেখছি। পিসিমার কণ্ঠভরা গাম্ভীর্য কাঁপলো থর থর করে।

নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করলো কৌশিক। শিরদাঁড়া সোজা করে বললো, তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছো পিসিমা। ফ্লুতে ক'দিন একটু কাবু করেছিলো। আজ দুদিন তো ভালোই আছি।

—তবে বিকেলে গোঙাচ্ছিলি কেন? কেমন যেন বেহুঁসের মতো। কোনো কথায় খেয়াল নেই। কেমন যেন—

একটু থেমে বললেন, বৌমা ফিরে এলে এবার বলবো—কুশের

দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না, তোমার জিনিস তুমি বুঝে নাও।
পিসিমা দীর্ঘনিশ্বাস চাপলেন।

—দেখবো তোমার কতো ক্ষমতা! কৌশিকের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হলো। —আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? কৈ, বুকে হাত দিয়ে বলো দেখি —কুশের দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। তার দুটি শীর্ণ চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো। অন্ধকারে পিসিমাকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

মুহূর্তকাল পরে উঠে দাঁড়ালেন পিসিমা। ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে কৌশিকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ওর চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, বড্ড ছেলেমানুষ তুই! বৌমা কাছে না থাকলে তোর যে ভালো লাগে না—একথা তুই না জানলেও আমি তো জানি। তোকে নিয়ে আমার কতো দুশ্চিন্তা সে তুই——

ভারি হয়ে উঠলো তার কণ্ঠস্বর। লঘু পায়ে তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

চোখ বুঁজে বসে রইলো কৌশিক। পিসিমা আর নীলাকে মনের মধ্যে বসিয়ে বার বার দেখলো। পিসিমা সাঁঝ আকাশের তারা আর নীলা ভোরের শুকতারা। একজন স্থিতি, অন্যজন গতি। একজন তাল-লয়-মাত্রায় বাঁধা সংগীত, অন্যজন সুরের নীড়। একজনের অভাবে কৌশিক ব্যর্থ, অন্যজনের অভাবে সে একান্তই শূন্য।

নীলা যদি আজ পাশে থাকত তবে নিশ্চয়ই বিকেলটা অদ্ভুত কল্পনার ভারে কাটত না। তার মাথায় বুকে পিঠে বার বার এতক্ষণ হাত বুলিয়ে দিত নীলা। দু-একখানা গান গেয়ে বিকেলটাকে সে হয়তো স্বপ্নিল করে তুলত। কৌশিক ভাবলো—নীলা ঠিক এই সময়টাতে তার সামনে বসে বলত ওর কলেজ-জীবনের কথা কিংবা তার দাদার বিভিন্ন দেশ ঘোরার রোমাঞ্চকর কাহিনী। মাঝে মাঝে নীলা পিসিমাকে টেনে আনত। বলত, একটা গল্প বলো না পিসিমা। কৃত্রিম ক্রোধে ভরে উঠত পিসিমার মুখ। ঠোঁট বাঁকিয়ে বলতেন,

তোরা কী ছেলেমানুষ! নীলার পীড়াপীড়িতে পিসিমা বাধ্য হতেন গল্প বলতে।

…নীলা কবে আসবে তা সে জানে না। গিয়েছে কোলকাতায় ওর বান্ধবীর জন্মদিনের উৎসবে। যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না! সবাই ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তিন-চার দিনের মধ্যেই ওর ফেরার কথা। কিন্তু সাত-আট দিন হয়ে গেলো ফেরার নাম নেই। —নীলা কাছে না থাকলে যে তার ভালো লাগে না, এই পুরোনো সত্যটা সে আজ প্রথম অনুভব করলো। পিসিমার মন-চেনার ক্ষমতাকে মনে মনে প্রশংসা করলো সে।

আজ কদিন তার নিজেকে কেমন একা একা মনে হচ্ছে। নিঃসংগতা বুকের মধ্যে ভার হয়ে চেপে বসেছে। কেমন একটা চাপা বেদনা। হয়তো এর হাত এড়াতেই আজকের বিকেলটাকে সে তার সর্বস্ব দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছিলো। বিকেলের শান্ত ছায়াঘন পুকুরটাই তাকে গভীরভাবে টেনেছিলো। …মৃত্যু তো সে কোনদিনই চায় নি। কোনদিনের জন্যেই তো তার মধ্যে পলায়ন-মনোবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। তবে…! তবে এমন করে জলের গভীরে হারিয়ে যেতে চাইছিল কেন? মৃত্যুর অচঞ্চল সৌন্দর্য, উজ্জ্বল বিলাসিতা অথবা অনন্ত মুক্তির হৃদয়ভেদী আহ্বানকে সে অচঞ্চল হয়েই ফিরিয়ে দিতে পারে। শুধু পৃথিবীর চঞ্চলতায়, অবিশ্রাম ব্যাকুলতায় আন্দোলিত হতে খুব ভালো লাগে। ভালো লাগে ব্যথার সব রং মেখে শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন হয়ে চলতে। ভীষণ ইচ্ছে করে শ্যামল পৃথিবীর ভাণ্ডার দস্যুর মতো লুট করতে। চুরি করতে মুখর সংসরের উপচে-পড়া ভাবরাশি।

স্কুল-কলেজে যখন পড়ত তখন প্রচুর গল্প কবিতা লিখেছে। একবার তো কলেজ-পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছিলো। ছাত্রজীবন শেষ হবার সংগে সংগে সে ছেড়ে দিয়েছে সেসব বাতিক। আজ অন্ধকারের মুখোমুখি বসে তার বার বার মনে হলো মস্ত ভুল করেছে সে লেখা ছেড়ে। পৃথিবীর চঞ্চলতা ব্যাকুলতা, ব্যথা-বেদনা, বিচিত্র ভাবরাশি,

শ্যামলিমা—সব কিছুই সাহিত্যের সুন্দর বিষয় হতে পারত। সাহিত্যই হতে পারত আজ তার সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাধান, ব্যথার গরিমা, তার বুকভরা সৌন্দর্য।

নীলা যে কবে আসবে!

এখন কটা বাজে? পৌনে-আটটা হবে হয়তো।

ঘরে গিয়ে রেডিওটা খুলে দিলে হয় না! না, থাক্। আজ ভালো লাগবে না। এই ভালো—বসে বসে শুধু ভাবা আর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কোনো কিছু দেখার চেষ্টা করা।

কম্বলটা বুকের উপর থেকে সরে গিয়েছিলো। ভালো করে টেনে দিলো।

কোনো দিকে শব্দ নেই। পাশের বাড়ি থেকে কোনো শব্দই তো ভেসে আসছে না! পুবে গোয়ালপাড়াটা এমন কঠিন স্তব্ধতা নিয়ে আছে কেন! কোনা পশু-পাখীর শব্দও ভেসে আসছে না। গ্রামটা কী ঘুমিয়ে পড়লো এর মধ্যেই! বাজারের দোকানগুলো কী বন্ধ হয়ে গিয়েছে! বাউরি পাড়ার কোলাহলটা তো কানে আসছে না আজ। —সে কী বধির হয়ে গেলো!

ঐ তো কুকুরের ডাক। উৎকর্ণ হলো সে। ······তালগাছের সর্ সর্ শব্দ তো এখনও উঠছে। স্পষ্ট শুনতে পেলো—কিছু দূরের জাতীয় সড়ক দিয়ে ককেয়খানা লরী চলেছে শব্দ তুলে।

নড়ে চড়ে বসলো সে।

আম-জাম-কাঁঠালের বনটা কেমন কিম্ভূত কিমাকার লাগছে। মনে হচ্ছে—ও বনের শেষ নেই। দুরন্ত রহস্য নিয়ে অনন্তকাল ধরে ও জেগে আছে। কৌশিকের মনে হলো—উদাস হয়ে সে ছুটতে পারে রহস্যকে দলিত করে, স্তব্ধ অন্ধকারকে বিচলিত করে।

পুকুরটাকে কেমন অচেনা মনে হচ্ছে। পুকুরের গভীরতা কতখানি? একদিন পরীক্ষা করতে হবে। একদিন ওর অটল শান্তির গভীরে নেমে উদ্দাম হয়ে উঠতে হবে। একদিন পুকুরের গর্ব—

আবার পুকুরের চিন্তা!

পুকুর, তার জল, তার গভীরতা, তীরের কাশবন একমুহূর্তে চিন্তা থেকে মুছে ফেলে উঠে দাঁড়ালো কৌশিক।

ঘরে ঢুকে উত্তেজিত স্বরে ডাকলো, পিসিমা !

মুহূর্তকাল পরে পাশের ঘর থেকে পিসিমা বেরিয়ে এলেন।

—একটু কফি খাওয়াবে—?

পিসিমা চলে গেলেন।

রেডিওটা খুলে দিলো। জোরে চালিয়ে দিলো রেডিওটা।

কম্বলটা একটা চেয়ারের উপর ফেলে দিয়ে হাত-পা টান করে শুয়ে পড়লো সে। একটু নিশ্চিন্ত হতে চাইলো।

রেডিওতে স্থানীয় সংবাদ চলছে : মহমেডান স্পোর্টিং রাজস্থানকে দুই-শূন্য গোলে, বালী প্রতিভা স্পোর্টিং ইউনিয়নকে তিন-শূন্য গোলে পরাজিত করেছে। আজকের মতো স্থানীয় সংবাদ এখানেই শেষ।

বড্ড জোরে বাজছে রেডিওটা। বাজুক। খুব জোরে—আরো জোরে বাজুক।

ঘর কাঁপছে নাকি ! কাঁপুক।

ঘরের মেঝেটা পাকা। দেয়াল মাটির। উপরে টালির চাল।—এ ঘর তো কাঁপবেই। ভেঙে পড়লেও বিস্মিত হবে না কৌশিক। একটুখানি বৃষ্টি হলেই জল পড়ে ঘরে। আজ দুবছর মীরাগ্রামে এসেছে কৌশিক—বিয়ের মাস তিনেক পরেই। বাড়িওলা বাড়িটার সংস্কার করলো না আজ পর্যন্ত। ঘরটা ভেঙে পড়লে ভীষণ খুশি হবে সে।

রেডিওতে এখন ‘সমৃদ্ধির পথে’ কথিকা চলছে।

কৌশিকের মনে হলো—সে বুঝি তার মনের সমৃদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। কেমন সব চিন্তা, অদ্ভুত অসংবদ্ধ ভাব কেবলি জট পাকাচ্ছে তার মনের মধ্যে। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে তার—ভেবে কূল কিনারা পায় না। মনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আবার তার মনে পড়লো পুকুরটার কথা।

সারা দেহ শক্ত করে সে পড়ে রইলো বিছানায়।

—কফি ফুরিয়ে গেছে। চা খা। চায়ের কাপ ছোট টেবিলটার

উপর নামিয়ে রাখলেন পিসিমা। হাসতে হাসতে বললেন, একটু নিরিবিলিতে বসে যে ধ্যান করবো, তার উপায় নেই।

—রেখে দাও কিছুক্ষণের জন্যে তোমার ধ্যান। একটু পাশে বসো তো।

—কানে ভীষণ বাজছে রেডিওটা। পিসিমা বন্ধ করে দিলেন রেডিওটা। কৌশিকের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আজ কী খাবি রাত্রে ?

—ভাত তো দেবে না। কালকের মতো দুধ আর চিড়েভাজাই না হয় দিও। কৌশিকের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

—দাঁড়া,—তোর খাবারটা বরং নিয়ে আসি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পিসিমা খাবার ও এক গ্লাস জল এনে টেবিলে রাখলেন।

—বৌমার চিঠিটা নিয়ে আসি।

পাশের ঘর থেকে পিসিমা একখানা চিঠি নিয়ে এলেন।

—তোমার চিঠি আমি আবার পড়বো কেন ? চায়ে চুমুক দিলো কৌশিক ! মনে মনে ভাবলো, পিসিমাকে চিঠি দিতে পারলো—আর আমাকে পারলো না ! মনে মনে বললো, কোলকাতা থেকে ফিরে এসো ! তারপরে দেখবো।

পিসিমা পড়তে থাকেন চিঠিটা ঃ আশা করি ভালো আছেন। এখানে এসে আটকে পড়েছি। বন্ধুরা আরো দু-চার দিন ধরে রাখবে আমাকে। চিন্তা করবেন না। প্রণাম নেবেন।

আর কী লিখেছে ? জ্বল্ জ্বল্ করে পিসিমার দিকে তাকালো কৌশিক।

কৌশিকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন পিসিমা। —আমার কাছে এর বেশী লেখা চলে না। এর বেশী কিছু লিখতে গেলে তোর কথাই লিখতে হতো। পিসিমা হাসি চেপে রাখলেন।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো কৌশিক। তাকে তো একটা চিঠি দিতে পারত নীলা ! ভাবতে চেষ্টা করলো সে—কী কারণে নীলা চিঠি দিলো

না তাকে ? বন্ধুরা কী ওকে চিঠি লিখতে দেয় নি। মাত্র কদিনের জন্যে বাইরে গিয়ে তাকে চিঠি লেখাটা পিসিমার কাছে হ্যাংলাপনা মনে হতে পারে—এমন চিন্তাও হয়তো ওকে পেয়ে বসতে পারে। মনকে সান্ত্বনা দিলো কৌশিক।

—কী ভাবছিস ?

—ভাবছি তোমার বৌমার দায়িত্বজ্ঞানের বহর কতোখানি! পিপিমার কাছে সরে এলো কৌশিক।

—বহুদিন বাদে পুরোনো বন্ধুদের সংগে দেখা, তাদের অনুরোধটা না রেখে আসেই বা কেমন করে!

কৌশিক মাথা রাখলো পিসিমার কোলে।

—তোকে দেখে আমার কী মনে হয় জানিস ? পিসিমা হাত রাখলেন কৌশিকের কপালে।

কৌশিকের দৃষ্টি যেন দপ্ দপ্ করে উঠলো।

—তুই বাইরের জগতের জন্যে নয়, ঘরের জন্যে। ঘরমুখো হয়ে কাজ করতেই তোর যেন বেশী আনন্দ।

কৌশিকের মনে হলো—পিসিমা বুঝি চাবুক মারলেন তাকে। চোখ বন্ধ করলো সে। সে কী নিতান্ত ঘরের জন্যে! সে কী এতটুকু!

পিসিমা মৃদুকণ্ঠে বললেন, তোর বাবা ঘরের আরাম কোনদিনই চান নি। কলেজ ছেড়ে বেরোবার পর দশ দিনের জন্যেও বোধ হয় বাড়িতে থাকেন নি। তবে ঘরকে অগ্রাহ্য বা অবজ্ঞা করে বাইরের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি কোনোদিন। কৌশিকের মাথায় হাত বুলোতে থাকেন তিনি।

কৌশিক তার বাবার ইতিহাস জানে। খুব ভাল ভাবেই জানে। তিনি ছিলেন বিপ্লবী। বৃটিশ-শাসকের কারাগারে বন্দী থেকেছেন বহুদিন। নিজের স্বার্থকে বড়ো করে দেখেন নি একদিনের জন্যেও। বাবার ডায়েরীতে সে পড়েছে,—সংগ্রামই জীবন। লাইফ ইজ এ মুভমেণ্ট—এ্যান ইটারন্যাল ফ্লো। সংগ্রামের চঞ্চলতায় ডুবে নিজেকে উপভোগ করবার তীব্র ইচ্ছায় প্রতি মুহূর্তে জ্বলতেন তিনি।

হ্যারিকেনটা একবার দপ্ করে উঠলো।

পিসিমা বললেন, তোর মা প্রতিদিন রাত্রিতে কাঁদতেন। খুব ভালো গান জানতেন তোর মা। মাঝে মাঝে গান গাইতেন। মনে হতো—কান্না বুঝি সুর হয়ে ঝরে পড়ছে। ছোট্ট নিশ্বাস ফেললেন পিসিমা।—তোর তো মার কথা মনে পড়ে না। তুই হবার আগে পর্যন্ত তোর মার মুখে কোনোদিন হাসি দেখি নি। মুহূর্তকাল চুপ করে আবার বললেন, তোর মা সংসারকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। আমাকে অনেকদিন বলেছেন, 'ঠাকুরঝি, বাইরের উন্মত্ততাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছি নে। উনি কতো বলেছেন, কিন্তু কিছুতেই নারী-সমিতির হয়ে বাইরের কাজ করতে পারলাম না। সংসারের প্রতি নিস্পৃহ হওয়া আমার সম্ভব নয়, ঠাকুরঝি।

পিসিমা চুপ করলেন।

—থামলে কেন? চোখ বুজেই বললো কৌশিক।

ম্লান হাসলেন পিসিমা। বললেন, মাটি গাছ-পালা আলো-হাওয়া ফুল-ফল পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকেই তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। মৃত্যুর আগে তোর মা যে কথা বলেছিলেন—সে কথা মনে পড়লে—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন পিসিমা। —না, তোর ভালো লাগবে না সে কথা, কুশ।

সংযত কণ্ঠে কৌশিক বললো, বলো পিসিমা।

পিসিমা বুঝলেন, কুশ একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে। তবু মৃদুকণ্ঠে বললেন, তার মায়ের মতো সংসারী সৌন্দর্য-প্রেমিকা এ জীবনে আর কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মৃত্যুর আগে তোর মা বলেছিলেন, 'দুঃখ রয়ে গেলো মাটির মাধুর্য, শান্ত সংসারের রূপ-রস মনভরে উপভোগ করতে পারলাম না।' জড়িয়ে গেলো পিসিমার কণ্ঠস্বর।

কৌশিকের বুকের ভিতরটা ছটফট করছে! উদ্গাত অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করলো সে।

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা। টেবিল-ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ।

উপর থেকে একটা টিকটিকি বিছানার উপর পড়েই ছুটে পালালো। তালগাছের পাতায় এখনো সেই সর্ সর্ শব্দ।

কৌশিক চোখ খুললো। মশারির পাশে একটা জোনাকি মিট মিট করে উড়ছে। হ্যারিকেনটার চারপাশ ঘিরে পাক খাচ্ছে একটা মথ ও গোটাকয়েক পতংগ। জানালার বাইরে একফালি আকাশে তারাগুলো কেমন এক ধরণের অস্পষ্টতা নিয়ে ছায়া-ছায়া আলো ছড়াচ্ছে। সেই একফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মন মৃত মা-বাবার জন্যে হাহাকার করে উঠলো। তার সমগ্র সত্তা যেন অন্তহীন ব্যথার রাজ্যে এক নিষ্ফল হাহাকারে ফেটে পড়তে চাইছে।

পিসিমাকে সজোরে জাপটে ধরে তাঁর কোলে মুখ লুকালো সে।

পিসিমা হাসবার ভান করে বললেন, তুই অনেকটা তোর মার মতো।

চমকে উঠলো কৌশিক। তার মায়ের মতো সে! মাটি আকাশ গাছ-পালা ফুল-ফল আলো-বাতাস সে কী মায়ের মতো প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পেরেছে? সংসারে উপচে-পড়া রূপ-রং-রস সে কী সত্যিই মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করার জন্যে কোনাদিন উদ্‌গ্রীব হয়েছে? সংসারের মদিরা আকণ্ঠ পান করতে চেয়েছিলেন তার মা, পৃথিবীকে উপভোগের বস্তু মনে করেছিলেন তিনি। কৌশিক মায়ের মতো এমন করে পৃথিবীকে তো কোনোদিন চায় নি! তাহলে সে কী চেয়েছে? বাবার মতো সংগ্রাম-মুখরতা, উন্মুক্ত বিশ্বের সর্বনাশা মুক্তি? তার উনত্রিশ বছরের জীবনে সে কী চেয়েছে, কী না চেয়েছে এই ভারি মুহূর্তে তা ভেবে ঠিক করা সম্ভব নয়।

—কুশ—কুশ! পিসিমা সচকিত হয়ে ডাক দিলেন।

—উঁ! যেন চেতনার অন্যপ্রান্ত থেকে সাড়া দিলো কৌশিক।

—খেয়ে নে, বাবা। পিসিমার কণ্ঠ অসীম কোমলতায় কাঁপছে।

—নে, ওঠ।

আস্তে আস্তে উঠে বসলো কৌশিক। কোথায় ডুবে-যাওয়া চোখ-

দুটো আস্তে আস্তে মেললো। পিসিমার দিকে চেয়ে লজ্জিত হাসি হাসলো।

খক্ খক্ করে কয়েকবার কেসে সে বললো, তুমি যাও—শুয়ে পড়ো। আমি খেয়ে নিচ্ছি।

পিসিমা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

জানালা দিয়ে একফালি আকাশের দিকে তাকালো কৌশিক। তারাগুলো এখনো সেই ছায়া-ছায়া আলো ছড়াচ্ছে। বিছানা থেকে নেমে এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গেলো জানালার দিকে। মনে হলো—সব বদলে গেছে। কী একটা পরিবর্তন পৃথিবীর রূপ পালটে দিয়ে গেছে। তার অসুস্থতা, নীলার অনুপস্থিতি, পিসিমার মুখে মা-বাবার কথা, আজ বিকেলের সেই সজাগর স্বপ্নটা তার অত্যন্ত চেনা পৃথিবীকে একেবারে অচেনা করে দিয়ে গেছে।

স্তব্ধ নির্বাক অন্ধকার বনের পাশের পুকুরের উপর চেপে বসে আছে। ওই পুকুরের জলেই ডুবে যাওয়ার—হারিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন সে দেখেছে। ডুবে যাওয়ার স্বপ্নটুকুর মধ্যে অবিশ্রাম মুক্তির কোনো সংকেত হয়তো আছে। নিঃসীম যাত্রার সাংকেতিকতা স্বপ্নটুকুর মধ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে। অটল শান্তিকে ক্লান্তিকর একটা অবস্থা বলেই মনে হয়েছে। বিশ্বের রূপময় আয়োজনকে, হাসি-কান্নার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলাটাকে মনে হয়েছে একটা সৌন্দর্য—জীবনের যথার্থ দীপ্তি।

কৌশিকের দৃষ্টি ডুবে গেলো অন্ধকারের মধ্যে।....পুকুরের জলে হাওয়ারা কী সুর তুলেছে? স্বচ্ছ কালো জল কী একদিন উচ্ছল হয়ে উঠবে না? একদিনের জন্যেও কী মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হবে না?

স্তব্ধ নির্বাক স্পন্দিত কৌশিকের মনে হচ্ছে—পুকুরের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া রাজ্যের অন্ধকার অন্তরংগতা নিয়েই চেয়ে আছে তার দিকে। রাত্রির বাতাসে পুকুরটা কী এক ইশারা বুঝি ছড়িয়ে দিয়েছে।

বিছানায় দেহ এলিয়ে দেবার কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়েন

পিসিমা। কিন্তু আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। অনেকক্ষণ ধরে ইষ্টনাম জপ করার পরে কিছুক্ষণের জন্যে তন্দ্রা এসেছিলো। একটা কুকুরের তীক্ষ্ণ চীৎকারে তন্দ্রাটুকু কেটে গেছে। স্মৃতির গভীরে ডুবে যাচ্ছেন তিনি। সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নাভরা কত ঘটনা চোখের সামনে নেচে নেচে উঠছে।

বাইরে চঞ্চল হয়ে যে বাতাসটা ছোটাছুটি করছিলো কখন এক সময় আহত হয়ে থেমে গেছে। ঝিঁঝিঁর একটানা ডাক তীক্ষ্ণ হয়ে স্তব্ধ অন্ধকারকে সচকিত স্পন্দিত করার চেষ্টা করছে।

কোনো দুঃখ-শোক নেই, বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। ভাগ্যের রূঢ় পরিহাসকেও আজ মনে স্থান দেন না অনিলা দেবী। জীবনের ন্যায়-অন্যায়, আশা-আকাংক্ষা, হতাশা, আনন্দ-বেদনা, অন্ধকারের অগ্নি-বিলাসের মতোই নিতান্ত মিথ্যে, আলেয়ার কান্নার মতোই ভুল। আজ তাঁর জীবনযাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত সত্য ও সমৃদ্ধ। এই জীবনকেই তিনি বুঝি চেয়েছিলেন মনে মনে। হয়তো এই জীবনের স্বপ্নই তিনি দেখেছেন। তাঁর সত্তা কত প্রকারে এই জীবনের ছবিই বার বার বোধ হয় কারণে অকারণে এঁকে এসেছে।

কৌশিককে নিজের হাতে মানুষ করেছেন। সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে লালন করেছেন, সমস্ত স্নেহ দিয়ে পালন করেছেন। দুবছরের কৌশিক তাঁর হৃদয়ের সবটুকু রস নিয়ে বড়ো হয়েছে। আজ কৌশিক যখন 'পিসিমা' বলে কাছে এসে দাঁড়ায়, কোলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে থাকে, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতায় স্থির হয়, তখন তাঁর মনে হয়—সত্য শিব সুন্দর এই জীবনেই। মনে হয়—তাঁর জীবন পরিপূর্ণতার মধ্যে উদ্ভাসিত। এই কৌশিককে, কৌশিকের এই সংসারকেই বুকের গভীর গহণে ভোরের স্বপ্নের মতো হয়তো জাগিয়ে রেখেছিলেন। একদিকে তাঁর গুরুদেব—তাঁর প্রাণের ঠাকুর তাঁকে এক বিশাল মহিমার মধ্যে তুলে ধরেছেন, অন্য দিকে তাঁর হৃদয়ের ধন—তাঁর দুরন্ত আদরের কৌশিক তাঁর তীব্র বাসনার উপর এক আশ্চর্য প্রেমের সৌধ নির্মাণ করেছে। কৌশিক আর ঠাকুর। কে বড়ো, কে বিরাট তা

তিনি জানেন না। জানেন শুধু—ঠাকুর না থাকলে কৌশিক মিথ্যে, কৌশিক না থাকলে ঠাকুর বর্ণহীন।

সমস্ত চরাচর অন্ধকারের মধ্যে শিথিল হয়ে মিশে আছে। শুধু একটা ক্লান্তিহীন চিন্তার মাঝে জেগে আছেন পিসিমা।

দুটি ঘরের মাঝখানের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে হ্যারিকেনের খানিকটা আলো এসে পড়েছে পিসিমার ঘরে। মশারির এক প্রান্ত ছুঁয়ে আলোটুকু গিয়ে পড়েছে দেয়ালে। পাশের ঘরে বুঝি অঘোরে ঘুমোচ্ছে কৌশিক। দুর্বল দেহটা বিছানার সংগে মিশিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে ও। ঘুমের গহনে ওর দুবল দেহ শক্তি সংগ্রহ করুক।

অনেকদিন পর কৌশিক কোলের মধ্যে, বুকের কাছে পেয়েছিলেন পিসিমা। কৌশিককে আজ যখন কোলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলো সেই সময়টি কতো মাধুর্য, কতো সৌন্দর্য নিয়েই না তাঁর বুকের মধ্যে ধরা দিয়েছিলো। সেই সময়-টুকুর উষ্ণতা এখনো যেন তাঁর দেহে মনে জেগে আছে। কৌশিকের বিয়ে হবার পর এমন মুহূর্ত খুব বেশী আসেনি। তবে তার জন্যে কোনো দুঃখ বা ক্ষোভ নেই তাঁর মনে। বরং কৌশিককে পূর্ণ হতে দেখে. বিকাশের দিকে এগোতে দেখে গভীর তৃপ্তির শ্বাস ফেলেন তিনি।

পিসিমা ভাবলেন, নীলার মধ্যেই আমার কুশ তার পিসিমার আশ্রয় নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে। নীলাই পারবে পিসিমাকে কৌশিকের সামনে জাগিয়ে রাখতে।

সহসা চমকে ওঠেন তিনি। যেন বিদ্যুতের একটা তীব্র জ্বালাকর স্পর্শ তাঁর সবাংগ কাঁপিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়। না, না, নীলা কেন পিসিমার প্রতিনিধিত্ব করবে! নীলা নীলাই হবে। মনে মনে দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে গুরুদেবের নাম নিয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন তাদের। নীলাকে যেন বুকে টেনে নিয়ে বললেন, বৌমা তুমি হবে তোমার স্বামীর সমস্ত জিজ্ঞাসার মহত্তম উত্তর। তুমি হবে আমার কুশের আনন্দের দূতী। আরো যেন অনেক কিছু বললেন। যার নাগাল পায় না।...কৌশিককে যেমন নিজের হাতে গড়ে

তুলেছেন ; বৌমাকেও তেমনি কৌশিকের উপযুক্ত সহধর্মিণী হিসাবে দেখতে চান, সংসারের ধারিকা পালিকা হিসাবে গড়ে তুলতে চান।

বাইরে নিশাচর পাখির ডাক। ঘরের মধ্যে খোলা জানালা দিয়ে একটা বিড়াল ঢুকছে। তক্তোপোষের নীচে যে ভাঙা টিনের সুটকেসটা আছে সেখানে বিড়ালটা খুট্‌খুট্‌ শব্দ তুলছে মাঝে মাঝে।

পিসিমা শুয়ে আছেন ক্লান্তিহীন চিন্তার মধ্যে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তাঁর চিন্তার মধ্যে তরংগ তুলেছে।

সাতাশ বছর তিনি কৌশিকের পাশে আছেন। সেই যে দাদার আহ্বানে ছুটে এসে শিশু কৌশিককে বুকে তুলে নিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত সেখান থেকে তাকে নামাতে পারেননি। ……নারীকল্যাণ সমিতির সহ-সম্পাদিকা রূপে তিনি তখন কাজ করছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর দাদাই তাঁকে সমিতিতে নিয়ে এসেছিলেন। বয়স তখন তাঁর উনিশ-বিশ হবে। অল্পদিনের মধ্যেই সমিতিতে তিনি একটা বিশেষ আসন করে নিয়েছিলেন। প্রবীণা মহিলারা পর্যন্ত তাঁর পরামর্শ নিতেন। সমিতির কাজ ছিলো দিনের বেলায় একটি নারী বিদ্যালয় পরিচালনা করা আর রাত্রে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীও তিনি ছিলেন। আলোচনা সভার পুরুষরাও নিমন্ত্রিত হয়ে অনেক সময় আসতেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতারা কখনো সখনো সভায় আসতেন। সমিতির আর একটা গোপন কাজ ছিলো জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সাহায্য করা। একবার তাঁর উপরই দায়িত্ব পড়েছিলো সরকারের নজরবন্দী একজন বিপ্লবীর হাতে এক-চিঠি পৌঁছে দেবার। আনন্দ-ভয় উত্তেজনার ব্যাপার সেটা। জীবনের আলো-অন্ধকারের মধ্যে সেই ব্যাপারটি আজো উজ্জল হয়ে আছে। চিঠিটা বিপ্লবীর হাতে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছিলেন এক সরকারী ডাক্তারের হাতে।

এখানে কোথায় এসেছিলেন? আচম্‌কা একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠেছিলেন সেদিনের অনিলা দেবী।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ভীরু চোখে চেয়েছিলেন পুরুষটির দিকে। বুঝেছিলেন, মানুষটি ডাক্তার। মানুষটির সামনে মুখ নীচু করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কী বলবেন ভেবে উঠতে পারেন নি।

বলুন—এখানে কেন? আবার সেই গম্ভীর কঠিন প্রশ্ন।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুললেন অনিলা দেবী। নিজেকে কঠিন করতে থাকেন।

সত্যি কথা বলুন। কঠিন আদেশের সুরে বেজে উঠলো গম্ভীর কণ্ঠ। নইলে আপনাকে পুলিশে দিতে বাধ্য হবো।

ঘামতে আরম্ভ করলো তাঁর সর্বাংগ। বললেন, এসেছিলাম একজনের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে। জড়িয়ে গেল তাঁর কণ্ঠস্বর।

জানেন, সেই ব্যক্তির খোঁজ নেবার জন্যে সরকারী ডাক্তার আছেন, সাদা পোষাক পরা পুলিশ আছেন। তাঁর জন্যে আপনাকে অযথা ব্যস্ত হতে হবেনা। সত্যি বলুন—কেন এসেছেন?

—এমনি দেখা করতে।

—তিনি আপনার কে হন?

অনিলা দেবী চুপ।

এবার ধমকে ওঠেন ডাক্তার মানুষটি, আপনার সংগে তাঁর কী সম্পর্ক?

—সব কথা সবাইকে বলা যায় না। দাঁতে দাঁত চাপলেন অনিলা দেবী।

—কিন্তু এখানে বলতেই হবে। আদেশ অমান্য করলে—

—আমি বরুন মৈত্রকে ভালবাসি। এবার যেতে দিন।

—ভা—লো—বাসেন! একটা বিদ্রূপের হাসি অনিলা দেবীর কানকে বিঁধিয়ে তুললো। —এই ভালবাসার শাস্তি কি জানেন? মানুষটি অনিলা দেবীর আরো সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পিছিয়ে যেতে চাইলেন অনিলা দেবী। পারলেন না। স্তব্ধ কঠিন হয়ে মাথা নীচু করলেন। আস্তে আস্তে বললেন ভালবাসার মানুষকে দেখতে আসা কী অপরাধ! সে অপরাধের জন্য যে কোনো

শাস্তি মাথা পেতে নেবো অনিলা দেবীর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও ঋজু হয়ে উঠেছিলো !

কয়েক মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন সন্ধ্যেবেলার সেই গম্ভীর মানুষটি ।

--এই অবস্থায় আপনাকে আমরা ছাড়তে পারবো না । আপনাকে পুলিশ ইনস্পেটরের সামনে উপস্থিত হতে হবে। ভয় নেই। সত্যি কথা বললেই মুক্তি পাবেন।

সারা দেহ মুহূর্তে হিমের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অক্ষমতা আর বোকামির জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে তো ভুগতেই হবে, বরুন বাবুকেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ যদি দায়িত্বটা না নিতেন তিনি !

সেই রাত্রেই পুলিশ ইনস্পেকটরের কাছে তাঁকে উপস্থিত করা হয়েছিল।

—আপনি বলছেন—আপনি বরুন বাবুর বিলাভেড। কিন্তু আপনি তো দেখছি একজন সম্ভ্রান্ত বিধবা। ইনস্পেকটর শাণিত হাসি যেন বিদ্ধ করতে চেয়েছিলো অনিলা দেবীর বুক।

এক গাল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ইনস্পেকটর কটাক্ষ হেসে জিজ্ঞেস করলেন, এই দলে কতদিন আছেন ? আপনি টেরোরিষ্ট ?

—কী বলছেন ? ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে উঠেছিলো অনিলা দেবীর মুখখানা ।

—অত্যন্ত সাদা কথা বলছি। লভ শিখেছেন, এ্যাকটিং করতে শিখেছেন, আর আমার প্লেন কথাটা আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড করতে পারছেন না ! —ডক্টর সেন, আপনি কী বুঝলেন ?

ডাক্তার সেন ইনস্পেকটরের কথার ধরনে কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলেন। আমার মনে হয় মিষ্ট্রি এর মধ্যে নেই। তবে আপনি বরুণ মৈত্রের ঘরখানা সার্চ করুণ। সেই গম্ভীর স্বর আশ্চর্য কোমলতায় থম থম করছে।

ডাক্তারের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিলো। এত-

ক্ষণ ডাক্তারের দিকে ভালো করে তাকাবার অবকাশ ছিলো না অনিলা দেবীর। এখন দেখলেন —মানুষটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। চশমার কাচ ডাক্তারের চোখছটোকে ঢেকে রাখতে পারে নি। মুহূর্তকাল পরেই চোখছুটো নামিয়ে নিয়েছিলেন অনিলা দেবী।

সেই রাত্রেই পুলিশ গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলো বরুণ মৈত্রের ঘরখানা। কিছুই পাওয়া যায় নি। একখানা প্রেমপত্র পাওয়া গিয়েছিলো। বিরহ বেদনার কথায় ভর্তি ছিলো চিঠিখানা।

···আজো সে কথা মনে পড়লে ভীষণ হাসি পায় অনিলা দেবীর।

সেদিন পুলিশ তাঁর নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলো। ডাক্তার সেন তাঁকে বাড়িতে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। রাত দশটার সময় গাড়ি থেকে অনিলা দেবী নেমে পড়লে ডাক্তার সেন মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, সরকারী ডাক্তার হলেও —পুলিশ মহলে বিচরণ করলেও আই পোজেস্ দ্য কোয়ালিটি অব্ ট্রু হার্ট। প্রয়োজনে আমিও আপনার ফ্রেণ্ড হতে পারি, অনিলা দেবী। হোপ ইউ উইল নট্ ফোরগো মাই ক্লেম।

আর ভালো লাগছে না রাতজাগা চিন্তার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে। ঘুম যে কখন আসবে! তন্দ্রা-ভরা চোখ মেলে শুয়ে রইলেন পিসিমা। মশারির একপাশে ছুটো জোনাকি মিট্‌মিট্ করছে।

সাতাশ বছরের অন্ধকার ভেদ করে ডাক্তার সেনকে আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন পিসিমা। ডাক্তার সেনের স্মৃতিটা আজ অনেক সহজ তৃপ্তিতে ভরা। স্মৃতিটা আজ আর বিষাক্ত নয়। কোনো কোনো অলস মুহূর্তে ডাক্তার সেনকে নতুন করে মূল্যায়ন করতে বেশ লাগে। অথচ পাঁচ বছর আগেও ডাক্তার সেনের সম্পর্কে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ মনে পুষতেন পিসিমা। আজ অনায়াসে নিজের স্বচ্ছন্দতার মাঝে মগ্ন হয়ে বসে সেদিনের সেই পুরুষটির বিচিত্র চেতনার পরিমাপ, উল্লাস উচ্ছ্বাসের যথার্থতা বিচার করতে পারেন। বুকের ভিতরটা এতটুকু কষ্টও অনুভব করেন না। আজকার আনন্দের কাছে সেদিনের ঘটনা সহজ সাবলীল স্বাভাবিক!

আজ তাঁর জীবনে পর্যাপ্ত স্বস্তি। বহুদিনের ওপার থেকে কোনো দুঃস্বপ্ন যদি জীবন্ত হয়ে ফিরে আসে, তবু আজকের দীপ্তি তাঁর নষ্ট হবেনা। বহুদিনের আলো-আঁধারের স্পন্দনে রোমাঞ্চিত হয়ে কোনো সুখ-ঐশ্বর্যের স্পর্শ তাঁর জীবনকে যদি নন্দিত করে, তবে তা কখনো বড়ো হয়ে উঠতে পারবে না। ঠাকুর —তাঁর —জীবন্ত আদর্শ তাঁকে তো সম্পূর্ণ করে তুলেছেন। তাঁর কৌশিক সংসারের আলো হাওয়ায় তাঁকে রমণীয় করে তুলেছে।

মনে পড়ে কিশোরী অনিলা কামনা করতো রাজার মতো স্বামী, ঘরভরা ঐশ্বর্য। রাজার মতো স্বামী তিনি পেয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষিত জমিদার পুত্রের সংগেই তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। ঘরভরা ঐশ্বর্যও পেয়েছিলেন। কিন্তু সে রাণীগিরি দুবছরেই ফুরিয়ে গেলো। এক দিন শূন্য হাতে শুভ্র বসনে নারীত্বের অগৌরব নিয়ে কোলকাতায় ভাইয়ের বাড়িতে এসে দাঁড়ালেন।

···দাদা বলেছিলেন, তুই কাঁদছিস্ অনি। তুইতো ভাগ্যবতী। নারীত্বের এমন অনাসক্ত মুক্তি ক'জনের ভাগ্যে জোটে! রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য পড়িস্ নি —'যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে, মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তিমদ ধারা নাহি চাহি, নাথ।' নৈবেদ্য, খুব মন দিয়ে পড়িস্। রামায়ণ মহাভারত গীতা সময় পেলেই পড়বি। দাদা তাঁর পিঠে হাত রেখেছিলেন। —বাইবেল, কোরাণ, কালিদাস মিলটনও মাঝে মাঝে পড়বি। নতুন শক্তি, নতুন জীবন, নতুন গতি পাবি। যেখানে শক্তি নেই, গতি নেই—সেখানেই তো শূন্যতা।

আর একদিন দাদা বলেছিলেন, আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার অর্জনই তো বড়োকথা। আমি দেখতে চাই -সেই অধিকার অর্জনের পথেই দৃঢ় নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিস। দাদার বলিষ্ঠ কণ্ঠে আদেশের দীপ্তি প্রখর হয়ে উঠেছিলো।

দাদার সেই আদেশকে বুকের শক্তি দিয়ে সে লালন করেছে। সমস্ত জীবনকে দাদার জীবনের জীবন্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতে

প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। একটি জ্বলন্ত আদর্শের জন্যে নিজের সব খুইয়ে নিজেকে পূর্ণ করতে শপথ করেছে। নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করেছে।···তারপর দাদা একদিন নারী-কল্যাণ সমিতির বিপুল কর্তব্যের মধ্যে ফেলে রেখে উধাও হয়ে গেলেন। এখানে দেড় বছর কেটেছে কর্ম মুখরতার মধ্যে। আর এক বছর কেটেছে···

ঘরের পাশেই একটা কুকুরের তীক্ষ্ম চীৎকারে যেন ছিঁড়েছিঁড়ে গেলো আঁধারের পর্দা।

সেই জোনাকি তুটো ঘরের মধ্যে এখনো জ্বলছে নিভছে।

বাইরের থেমে যাওয়া হাওয়া আবার জেগেছে। হিমেল হাওয়া। ঘাসে পাতায় শিশির ঝরছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে হ্যারিকেনের সেই আলোটুকু এখনো আসছে।

হারিয়ে যাওয়া হাওয়া আবার ফিরে আসছে। ·· সমিতির কাজ ছাড়াও আর একটা দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। সকালে সন্ধ্যায় দাদার ছোট্ট ছেলেটার সংগে একটু খেলা করা। ছোট্ট কৌশিকের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতেন। দৈনন্দিন কাজের চিন্তাকে ডিঙিয়ে মন কখনো সখনো কোথায় ডুব দিতো। কৌশিককে বুকের মধ্যে চেপে ধরে নীরব কান্নার উদার স্তব্ধতার মধ্যে লীন হয়ে যেতেন।

···বৌদিকে বলতেন, তোমার ছেলে জিনিয়াস হবে, বৌদি।

—জিনিয়াস ফিনিয়াস ভাই বুঝি নে। তোমরা আশীর্বাদ করো ও যেন সংসারকে ভালোবেসে বড় হতে পারে। বৌদির কণ্ঠস্বর কেমন করুণ ও কোমল মনে হতো।

—সংসারটাকে বৃহৎ অর্থে ধরছো তো? অনিলা দেবী মিটি মিটি হেসে কৌশিকের কপালে চুমো খেতেন।

বৌদি কথা বলতেন না। গরম তুধের বাটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকাতেন।

—বৌদি, তোমার হাসিমুখ দেখছি বলে তো মনে পড়েনা।

বৌদির মুখে বিষণ্নতার ছায়া ঘনতর হতো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বলতেন, বিয়ের আগে হাসতে জানতাম। কিন্তু চর্চার অভাবে ওটা যে ভাই একেবারে ভুলেগেছি। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার বলেছিলেন, বিয়ের পরে একদিন প্রাণখুলে হেসেছিলাম! ফুলশয্যার দিন। বৌদির কণ্ঠস্বর যেন চিরে যেতো।

একটা পশমেয় আসন পেতে বৌদি বসতেন। অনিলা দেবী গম্ভীর হয়ে বৌদিকে দেখতেন।

—বোধ হয় মৃত্যুর দিন ছাড়া আমি আর হাসতে পারবনা ঠাকুরঝি। জোর করে হাসতে গিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন বৌদি। কান্নার অসহ্য আবেগে ফুলে ফুলে উঠতো তাঁর সুন্দর সুডোল দেহখানা।

শ্বাস রুদ্ধ করে বসে থাকতেন অনিলা দেবী।

গলির মোড়ের চায়ের দোকান থেকে উচ্ছোসিত কোলাহল ভেসে আসতো। কখনো ঘোড়াগাড়ি বা রিক্সার টুং-টাং শব্দ, কখনো মোটরের শব্দ।

মৃত্যুর দিনে সত্যিই হেসেছিলেন বৌদি। প্রাণভরা হাসি। ঘুমন্ত বিষণ্ণতা আর কারুণ্য ছাপিয়ে এক ঝলক দুর্লভ শুভ্রোজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছিলো চোখে-মুখে, কণ্ঠের শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে। আশ্চর্য কোমলউচ্ছল স্বরে তিনি বলেছিলেন, অচরিতার্থ বাসনা নিয়ে সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু সংগে নিয়ে যাচ্ছি একটা পরম সান্ত্বনা। কৌশিকের মুখে, মাথায়, বুকে, পিঠে কম্পিত হাত বুলিয়ে বৌদি বলেছিলেন, তোমার কুশ সত্যিই বড়ো হবে।

অনিলা দেবী পাথর হয়ে গিয়েছিলেন! বৌদির মুখের দিকে তাকাবার ক্ষমতা সেদিন তাঁর ছিল না।

আশ্চর্য কোমল স্বরে বৌদি বলেছিলেন, তুমি কষ্ট পেয়ো না ভাই। এ হবে - আমি জানতাম। আমার কুশকে যেদিন তুমি নিজের ছেলের মতো করে নিয়েছো সেদিনই জানতাম আমাকে খুব তাড়াতাড়িই মরতে হবে। বৌদির মুখের শান্ত শুভ্র হাসিটা শাণিত ফলার মতো স্তব্ধ মূর্তি অনিলা দেবীর বক্ষ বিদ্ধ করেছিলো।

একটা মর্মভেদী চীৎকারে সারা আকাশকে কাঁপিয়ে তুলতে চেয়ে-

ছিলেন অনিলা দেবী। পারেন নি। কৌশিককে বুকে তুলে নিয়ে ঠাকুরঘরে ছুটে গিয়েছিলেন শুধু।

বৌদির বড়দা কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার হরেন মিত্র যখন খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন তখন দেরী হয়ে গেছে।

অনিলা দেবী, তাঁর মামাতো ভাই, বাড়ির ঝি সবাইকে ডেকে সজল চোখে শুধু বলেছিলেন, আপনারা থাকতে একটা মানুষ বিষ খেলো! আপনারা একটুও জানতে পারলেন না! আপনাদের কী করা উচিত জানেন? মাথার চুল মুঠোতে ধরে নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করে উঠছিলেন হরেনবাবু।

কৌশিককে কোলে নিয়ে হরেনবাবু বলেছিলেন, আমার মা, ছোট ভাই আপনাদের ক্ষমা করতে পারবেন না। হরেনবাবুর দুচোখ থেকে জলের ধারা নামছিলো। ভেজা গলায় বলেছিলেন, আপনি তো বিজয়বাবুর বোন। আসল ব্যাপার কী? সশব্দে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন বরেনবাবু। ভয় নেই, জেরা করছি নে।

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনিলা দেলী। কিছুক্ষণ বাদে কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন, বিশ্বাস করুন—কিছু জানিনে আমরা।

—অন্য কেউ হলে কী করতো জানেন? রাগে লাল হয়ে উঠে-ছিলেন হরেনবাবু। —এই মৃত্যুর মূলে ষড়যন্ত্র আছে ভেবে পুলিশ ডাকতো।

দুহাতে মুখ ঢেকে সরে গিয়েছিলেন অনিলা দেবী। মনে করে-ছিলেন, আকাশের একটা বজ্র নেমে আসতে পারে না তাঁর উপর? এক মুহূর্তে সব নিশ্চিহ্ন। পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ বিচার বিশ্লেষণের সমাপ্তি ঘটতো এক লহমায়।

—বিজয়বাবুর কোনো সংবাদ জানেন? বিজয়বাবুর মামাতো ভাইকে প্রশ্ন করলেন হরেনবাবু।

—না। ভীত বেদনার্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন বিজয়বাবুর মামাতো ভাই।

—জেলে-টেলে পচছে না তো?

—বোধ হয় না।

—অমানুষ ছাড়া আপনাদের অন্য কিছু কেউ বলবে না। কোটের হাতায় চোখের জল মুছলেন হরেনবাবু।

বুকের স্নেহ দিয়ে রক্ত জল করে অনিলা দেবী কৌশিককে মনের মতো করে গড়ে তুলেছেন। দাদার সংসারের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ-ভাবে লীন করে অতীতকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি।

হরেনবাবুর মা কৌশিককে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনিলা দেবীর আলিংগন থেকে কৌশিককে মুক্ত করতে পারেন নি।

···বরেনবাবু, তাঁর মা, হরেনবাবুর ছোট ভাই বিজয় ঘোষ ও তাঁর বোন অনিলা দেবীকে ক্ষমা করতে পারেন নি। যে বাড়ির লোক বিপ্লবী বিজয় ঘোষের কথা দুরু দুরু বুকে মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছেন— যাঁর কথা বলতে যাঁরা অভিভূত হয়েছেন, শান্তার মৃত্যুর পর তাঁদের সব ধারণা এখন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। বিজয় ঘোষ আর তাঁর বাড়ির অন্য সবার সম্পর্কে তীব্র বিতৃষ্ণা আর অবজ্ঞা মিত্র বাড়ির প্রতিটি মানুষ পোষণ করতেন। বিজয় ঘোষ আর তাঁর আদরের বোন সম্পর্কে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর জ্বলন্ত বিদ্বেষ মিত্র বাড়ির অন্তরে। কোনদিন ভুল করেও এদিকে আসেন নি তাঁরা —এমন কী একমাত্র ভাগ্নে কৌশিককে দেখতেও না। যেদিন হাসপাতালে বিজয় ঘোষ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন সেদিনও কেউ আসে নি, —কৌশিকের কী অবস্থা হলো তা জানতেও না। স্কুল ফাইন্যালে কৌশিক প্রথম বিভাগে পাশ করার পর আনন্দের আতিশয্যে বড় মামাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। কোনো জবাব আসে নি। শান্তার আত্মহত্যার মধ্যে কোনো রহস্যের সন্ধান পেয়েই যে মিত্র বাড়ি সব সম্পর্ক ছেদ করেছে একথা বুঝতে অসুবিধে হয় নি কারুর। কৌশিক একবার

মামার বাড়ি গিয়েছিলো। এম.এ. তে পোলিটিক্যাল সায়েন্সে সেকেণ্ড ক্লাস হবার পর। .. হরেনবাবু ছাড়া আর কেউ কথা বলেন নি। ছোট মামা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। দিদিমা বেঁচে থাকলে কী করতেন তা ভাবার অবকাশ পায় নি কৌশিক।

হরেনবাবু আশীর্বাদ করেছিলেন। খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলেছিলেন, তোমাকে ডক্টরেট হতে হবে কৌশিক। বিলেত যাবার কোনো ইচ্ছে থাকলে জানিও।

আন্তরিক ইচ্ছে থাকলেও মামা বাড়ির সংগে আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নি কৌশিকের।

খোলা জানালার পর্দা সরিয়ে হিমেল হাওয়া ঘরে ঢুকছে। মশারি কাঁপছে। জোনাকি দুটো এখনো মিট মিট করছে। একটা টিনের কৌটোর গায়ে বোধ হয় বিড়ালের নখের আঁচড় পড়ছে —শব্দ উঠছে।

স্মৃতির সীমায় এলিয়ে পড়া মনটাকে গুটিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন পিসিমা।

ট্রেনের শব্দ কানে আসছে। কোন্ দিক থেকে আসছে ট্রেনটা? অন্ধকারে কান পাতলেন পিসিমা। লালগোলার ওদিক থেকেই আসছে ট্রেনটা।

এখন দেড়টা বোধ হয় বাজে।

হ্যারিকেনের আলোর রেখাটা আগের চেয়ে অনেক ক্ষীণ। তেল নেই কী লণ্ঠনে?

কৌশিক গভীর ঘুমে মগ্ন নিশ্চয়ই।

ওর ঘরের জানালাটা বন্ধ আছে তো? ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকলে—

বিছানা থেকে নামলেন পিসিমা।

বিড়ালটা এক লাফে জানালায় উঠে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আধভেজা দরজাটা খুলে দিলেন তিনি।

ধক্ করে উঠলো বুকের ভিতরটা। কৌশিক বিছানায় নেই। বাইরের দরজা খোলা— হাঁ হাঁ করছে।

—কুশ! গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না পিসিমার। জমাট হিমের মতো স্তব্ধ নিথর হয়ে গেলেম তিনি। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিটা খোলা দরজার বাইরে হোঁচট খেয়ে পড়লো।

বাইরে শব্দহীন নিথর অন্ধকার। ঘরের মধ্যে জমাট ভয়ের রূঢ় গাম্ভীর্য। পিসিমার সামনে সম্পূর্ণ পৃথিবীটা যেন বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি। গুরুমন্ত্র জপ করতে করতে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

বাইরের নিকষ কালো অন্ধকারের স্রোতে বিশ্বচরাচর যেন কোথায় ভেসে গেছে।

—কুশ—কুশ—কু—উ-উ-উশ—! অন্ধকারে কান পাতলেন পিসিমা। শুনলেন কারা যেন বলছে, কু-উ-উ—উশ!

বারান্দায় শালের খুঁটি ধরে দাঁড়ালেন। —কুশ—কৌ—শিক—!

মেটে রাস্তার ওপরে বনটার কাখাকাছি একটা আলোর রেখা চঞ্চল হয়ে ঘুরছে না! হ্যাঁ, একটা টর্চের আলোই ছটফট করছে।

চক্ চক্ করে উঠলো পিসিমার চোখ ছুটো।

অন্ধকারেই বারান্দা থেকে নেমে পিসিমা ছুটতে থাকেন। আলোর রেখাটা এগিয়ে আসতে থাকে।

মেটে রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন পিসিমা। খুব জোর হাঁফাচ্ছেন তিনি। সারা শরীর তাঁর ঘামছে।

টর্চের আলো এসে পড়লো পিসিমার মুখে।

কৌশিক এসে দাঁড়ালো ভীত স্তম্ভিত পিসিমার সামনে। পিসিমার শরীর কাঁপছে।

—কুশ! সর্বশক্তি দিয়ে কৌশিককে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। কৌশিকের বুকের ওপর মাথা কুটতে থাকেন তিনি।

—পিসিমা!

পিসিমা স্তব্ধ হলেন।

এক হাতে পিসিমাকে ধরে অন্য হাতে আলো ফেলতে ফেলতে

অগ্রসর হলো কৌশিক।

—কী যেন মনে হলো আর চলে গেলাম। কেমন একটা বিহ্বলতা কৌশিকের কণ্ঠে। —পুকুরটাকে একটা রহস্যময় ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার বলে মনে হচ্ছিলো। কেবলি মনে হচ্ছিলো ওর জলের গভীরে হয় কঠিন শান্তি, না হয় একটা গতির উন্মাদনা স্তব্ধ হয়ে আছে। ইচ্ছে হচ্ছিলো একবার নামি।

পিসিমাকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো কৌশিক। —পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে একটা প্রশ্নের সমাধান খুঁজ ছিলাম। সংগ্রাম-মুখরিত অবারিত মুক্তি বড়ো, না চঞ্চল পৃথিবীর রূপ রস বড়ো? কৌশিকের দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যে ভেসে গেলো।

কৌশিকের আপাদমস্তক বার বার দেখছেন পিসিমা। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর থর করে। ছল ছল করছে চোখ দুটো।

কয়েকবার দপ্ দপ্ করে উঠেই নিভে গেলো লণ্ঠনটা।

পিসিমা। অনেক দূর থেকে যেন ডাকলো কৌশিক।

কৌশিকের গায়ের চাদর শক্ত মুঠিতে ধরে পিসিমা সশব্দে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। —আমাকে কী কাঁদাতে চাস কুশ?

সাতশো বিঘে জমি নিয়ে বিরাট ফার্ম। এই ফার্মেরই কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক ঘোষ। ট্রাকটার দিয়ে জমি চাষ হয়। জমিতে আলোর মতো উজ্জ্বল ফসল ফলে। পাম্প দিয়ে সাতশো বিঘে জমির বুক ভরিয়ে তোলা হয়। মাটি কথা বলে, হাসে, স্পন্দিত হয়। দশটা গ্রামের মানুষ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে—ফসল নয়, উন্মুক্ত পরিবেশে সোনার কারবার চলেছে। মাত্র দু বছরের মধ্যেই আনন্দের বান ডেকেছে সাতশো বিঘে জমির বুকের উপর। এর আগেও ফার্ম ছিলো। কিন্তু এমন আনন্দ ছিলো না, জাঁকজমক ছিলো না। লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই চোখে পড়তো। আগের কর্মাধ্যক্ষকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছেন অংশীদারেরা।

মাঠের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হেমন্তের সকালের বাতাসে দুলে দুলে পড়া ফলন্ত ধানগাছের দিকে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে

কৌশিক। দুশ্চিন্তা আর আশংকা, আশা আর বিশ্বাস মনের মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

—বাবু! একজন কিষাণ এসে দাঁড়ালো। —আলুতে জল লাগবে।

—রমেন বাবুকে গিয়ে বল্। ওঁকে বললেই হবে।

লোকটি নমস্কার জানিয়ে চলে গেলো।

কৌশিক এগোলো। দক্ষিণদিকের মাঠের আলুর জমিটা দেখতে হবে।

বেশ লাগছে কৌশিকের। সকালের রোদে সারা শরীর ভিজিয়ে খোলা মাঠের চোখ জুড়ানো ঐশ্বর্যের মাঝে ঘুরতে বেশ লাগছে। একটা মধুর স্পন্দনে ভরে উঠেছে শরীরের প্রতিটি রোমকূপ। একটা মিষ্টি মেঠো গন্ধে ভরে উঠেছে মাঠের বাতাস।

কাপড়টা হাঁটুর উপর তুলে পরেছে কৌশিক। চটিসুদ্ধ পা শিশিরে ভিজে গেছে। পা দুটো শির শির করছে।

—এই যে দাদা, কেমন আছেন?

—ভালো। হাসলো কৌশিক। —আপনার খবর—

—খুব ভালো। মনে হচ্ছে খুব ভোরে বেরিয়েছেন।

—ভালো লাগছিলো না বাড়িতে।

—বৌদি নেই—ভালো তো লাগবেই না। বলেই হো হো করে হেসে উঠলো রমেনবাবু।

কর্কশ ধ্বনি ছাড়তে ছাড়তে একটা কাক উড়ে গেলো মাথার উপর দিয়ে। কর্মব্যস্ত কিষাণরা মুহূর্তের জন্যে তাদের দিকে একবার তাকালো।

মানুষটির প্রতি বিরক্তি আর ঘৃণায় সংকুচিত হলো কৌশিক। এ ধরনের নির্লজ্জ পরিহাস শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। অদূরে আলু-ক্ষেতের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

আজ দুবছর রমেনবাবুর সংগে মিশেছে সে। তার সংগে রহস্যালাপও মাঝে মাঝে করে। কিন্তু এমন নির্লজ্জ পরিহাস? রমেনবাবু এইরূপ

কোনোদিন করেছে কিনা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। করলেও এমন করে বুকে বাজেনি। রমেনবাবু এখানকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক—বিজ্ঞানের শিক্ষক। এই ফার্মের সহ-কর্মাধ্যক্ষ ও অংশীদার। মার্জিত, ভদ্র, বুদ্ধিমান, কর্মী মানুষ হিসেবেই সবাই তাকে চেনে। শিক্ষক হিসেবেও প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তার চেয়ে ছয়-সাত বছরের বড়ো রমেনবাবু। প্রথম প্রথম রমেনবাবুর মুখে 'দাদা' ডাকটা কৌশিকের খারাপ লাগতো। এখন সহ্য হয়ে গেছে।

—আজ আপনার ওখান থেকেই মাঠে আসছি। পিসিমার মুখেই শুনলাম প্রায় বারো দিন তিনি বাড়ি ছাড়া। সত্যিই বৌদির ভারি অন্যায়। আবার উচ্চ শব্দে হাসতে থাকে রমেন চক্রবর্তী।

চুপ করে রইলো কৌশিক। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু ভ্রূভংগী করলো। ভাবলো, একটা কিছু বলা উচিত। কিন্তু বিরক্তি আর ঘৃণা কাটিয়ে কিছু বলতে পারলো না। রমেন বাবুকে কাটিয়ে চলে যেতেও পারলো না।

এবার কৌশিকের মুখের দিকে তাকিয়ে রমেন কিছু একটা অনুমান করে নিলো। এক টিপ নস্যি নিয়ে রমেন বললো, এই মাত্র আপনার বাসা থেকে আসছি। এই মাঠের জলের পাম্প দুটো গড়বড় হয়ে গেছে। আমাদের মিস্ত্রী আজ কদিন ছুটি নিয়ে বাড়ী গেছে। কী করা যায় আপনিই বলুন।

—কী বললেন? আকাশ থেকে দৃষ্টিটা নামিয়ে আনলো কৌশিক। একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো সে। সহজভাবে রমেনবাবুর দিকে তাকাতে চেষ্টা করলো। —কী বলছেন? মিস্ত্রীর কথা! ছুটি ওর অবশ্যই প্রয়োজন ছিলো।

--না, আমি সে কথা বলছি না। জলের পাম্পটা সারাবার কী ব্যবস্থা করা যায়—তাই ভাবছি।

—বেলডাঙা থেকে কাউকে আনা যায় না? সুগার মিলের মিস্ত্রীকেও ডাকতে পারেন। কৌশিক বলতে বলতেই পা বাড়ালো।

কী মনে করে থেমে পড়লো। হাসবার ভান করে বললো, আপনি তো সায়েন্সের লোক। তাছাড়া কালীগঞ্জে আপনাদের তেলের কল তো ডিজেল ইঞ্জিনে চলে। আপনার কলকব্জার ব্যাপারে বিশেষ এক্স্‌পার্ট হওয়া উচিত।

একমুখ হেসে রমেন বললো, কাল অনেক চেষ্টা করেছি, পারলাম না। আসল গলদটা কোথায় ধরতে পারলাম না।
তা আপনি বলছেন --চেষ্টা আর একবার করবো। আই মাষ্ট—

অগ্রসর হলো কৌশিক। তার পায়ের উপর নুয়ে নুয়ে পড়ছে ফলন্ত ধান গাছগুলো। পিছনে তাকিয়ে দেখলো—রমেনবাবু তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের গতিবেগ বাড়ালো কৌশিক।

—হৈ—হৈ—হৈ। ছাগল কিংবা গরু তাড়াচ্ছে কিষাণরা। —হো—হো—হো— — ধর্‌-ধর্‌-ধর্‌—। ওই যে—ওই দিকে—

—দাদা—দাদা—শুনুন—শুনুন।

রমেনবাবুর কণ্ঠস্বর।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো কৌশিক। তার সহকারী রমেনকে সহ্য করতে পারছে না এখন।

—কী বলছেন ?

হাঁপাচ্ছে রমেন। —কোলকাতা যাওয়ার কী করলেন? বিরজলালের কাছে হাজার তিরানব্বই টাকা আর কানাই দাসের কাছে সাড়ে ছ'শো টাকা পাওনা। খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। আমি তো আগেই জানিয়েছি--আমার যাওয়া এখন সম্ভব হবে না। ঘড়ির দিকে তাকালো রমেন চক্রবর্তী।

এ ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন কৌশিক। মনে মনে লজ্জিত হলো। বললো, আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো। দেখি কী করি। যদি না যাওয়া হয়, তবে কোলকাতায় ফোন করে দেবো। চেক না হয় ওরা এখানেই পাঠিয়ে দেবে।

—এবার আমাদের বেগুনের ফলন নাকি বেশী হবে।

– হুঁ। পটলের কমতিটা বেগুন পূরণ করবে মনে হচ্ছে।

—তা করবে।

—আপনি পাম্পটার একটা ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে ফেলবেন কিন্তু। কিছু ব্যবস্থা করতে না পারলে আমাকে জানাবেন।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন যেয়েই একবার ট্রাই নেবো। না হলে সুগার মিলের মিস্ত্রীকেই—

—বাবু, আজ আমাকে ছুটি দেতি হবি। একজন কিষাণ এসে হাত জোড় করে প্রার্থনা জানালো।

—কী হলো তোর? কোনো অসুখ-বিসুখ—। সহানুভূতিতে ভরে গেলো কৌশিকের কণ্ঠ।

—না বাবু।

—তবে কা! কোথাও যাবি নাকি?

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিষাণটি।

—কী রে চরণ, কথা বলছিস্ না যে!

—না, না, ছুটি হবে না। কালও তুই ছুটি নিয়েছিস্। ধমক দিলো রমেন। কৌশিকের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর নরম করলো সে। —অতো ছুটি নিলে ফার্মের কাজ কী চলে রে চরণ। আলুগাছের গোড়ায় মাটি আর সার দেওয়ার কাজ আজকেই সেরে ফেলতে হবে। তোরা যদি সবাই ছুটি ছুটি করে ব্যস্ত হোস তবে কাজের কতো ক্ষতি হয় বল্ দেখি। চরণের পিঠ চাপড়ালো রমেন। —যাঃ, কাজে যা! তোর ছুটির ব্যবস্থা পরে করবো।

দ্বিরুক্তি না করে মাথা নীচু করে চলে গেলো চরণ বাগ্‌দী।

হয়তো সত্যিই চরণের ছুটির দরকাব ছিলো। মনটা খচখচ করতে থাকে কৌশিকের। ছুটি দিলেই বোধ হয় ভালো হতো।

—দেখলেন তে? অকারণে ছুটি নেবে। আরে বাবা, তোর জরুরী ব্যাপার থাকলে বল্! ছুটি দেবো না কেন? নিশ্চই দেবো। সম্মতির আশায় রমেন কৌশিকের দিকে তাকালো।

কৌশিক বললো, তা তো বটেই। ভাবলো, কারণে অকারণে ওদের প্রতি এতখানি উদারতা দেখানো ভালো নয়। হয়তো তার

প্রশ্রয় পেয়েই ওরা বেড়ে উঠেছে। এবার থেকে সতর্ক হতে হবে তাকে। রমেনবাবুর মতো চতুর ও সাবধানী হতে হবে।

কৌশিক অগ্রসর হলো চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে। রমেনও তার পাশে পাশে অগ্রসর হলো। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে, মন ভরে উঠছে হেমন্ত-সকালের দৃশ্যে-গন্ধে-স্পর্শে। সকালের রোদ, শীত-শীত মৃদু বাতাস, তরঙ্গায়িত ধানক্ষেত; মাঝে মাঝে কিষাণ কণ্ঠের দু-এক কলি গান তার স্পর্শকাতর মনকে সবলে আকর্ষণ করছে। তার অন্তর্লোক রৌদ্রঝলমল প্রভাতের উল্লাসময় আত্মপ্রকাশকে সম্পূর্ণ নিজের করে নেবার জন্য এই মুহূর্তে যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

—আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে দাদা। কিছুদিন ধরে ভাবছি পোলিটিক্যাল সায়েন্সে এম-এ'টা দেবো। আপনাকে হেল্‌প্‌ করতে হবে কিন্তু।

—আপনি যে বিজ্ঞানের লোক। জিজ্ঞাসু চোখে রমেনের দিকে তাকালো কৌশিক।

—প্রাইভেটে সায়েন্স সাবজেক্ট সম্ভব নয়। পার্‌মিশান দেয় না। তাই—। টিচার্স ট্রেনিং নেওয়া থাকলে যে কোনো সাবজেক্টেই এম-এ দেওয়া যায়।

—কেন—পিওর ম্যাথমেটিকস্‌ তো নিতে পারেন।

—তা পারি। তবে হেল্‌প্‌ করবে কে?

দুজনে আলুক্ষেতে এসে পৌঁছালো।

—নিজের উপর বিশ্বাস রেখে খাটুন—ঠিক হয়ে যাবে।

—আপনি যখন বলছেন—দেখবো চেষ্টা করে।

আলপথে এগিয়ে চললো দুজনে।

—কী রকম মনে হচ্ছে আপনার? মনে হচ্ছে আলুর ফলনও জোর হবে। কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হলো রমেনের।

উত্তর দিলো না কৌশিক।

—একটা আবৃত্তি করে শোনান না, দাদা।

—আবৃত্তি! দাঁড়িয়ে পড়লো কৌশিক।

—হ্যাঁ। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সেকস্‌পীয়ার যা ইচ্ছে। খুব ভালো লাগবে এখন। দাঁত বের করে নীরবে হাসলো রমেন।

—ওটা যখন-তখন হয়না।

—কিন্তু এই মাঠেই তো দু-একবার আবৃত্তি করতে দেখেছি আপনাকে।

হেসে ফেললো কৌশিক। এতক্ষণ গম্ভীর ছিলো। আর পারলো না।

কৌশিকের মন প্রসন্ন হয়ে উঠলো। মানুষটা নিতান্তই সরল। ওর কথাবার্তায় বোঝা যায় না—মানুষটি শিক্ষক। শিক্ষকোচিত বা বয়সোচিত গাম্ভীর্যের কিছুই নেই। এই মানুষটির কথাতেই সে কিনা কিছুক্ষণ আগে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো! মানুষটির সহজ পরিহাসকে অন্য মনে গ্রহণ করে বড়ো অন্যায় করেছে। মনের ভিতরটা খচ খচ করতে থাকে কৌশিকের।

কথা বার্তায়, চাল-চলনে মানুষটি শুধু সরলই নয়, মুক্ত। কোনো দুশ্চিন্তা নেই, ক্লান্তি নেই, ভয় নেই। যে কোন দায়িত্ব সহজে মাথায় নেয়, না পারলে অতি সহজেই দায়িত্ব ভার থেকে মুক্ত হয়। যে কোন বাধা বিপদ, কঠিন কাজের উপর দিয়ে খল খল করে ছুটতে পারে। কৌশিকের মনে হলো, বিয়ে করেন নি বলেই হয়তো রমেন চক্রবর্তী সমস্ত ভারকে কেটে বেরিয়ে যেতে পারে। সংসারের বিচিত্র বাঁধনে আবদ্ধ নয় বলেই প্রাণের ফুলঝুরি জ্বালিয়ে শৃংখলাবদ্ধ মানুষের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কৌশিক শুনেছে, যাত্রা থিয়েটারে দুহাতে টাকাও ব্যয় করে মানুষটা। আবার এও দেখেছে—সমস্ত বিদ্রূপ বিদ্বেষের সামনে দাঁড়িয়ে হো হো হাসিতে দিগন্ত কাঁপিয়ে দিতে পারে। দু-এক সময় কৌশিকের মনে হয় মানুষটি শিক্ষিত হলেও অসংস্কৃত। একদিন তার মুখ ফসকে বেরিয়েও পড়েছিলো, —'আনকালচার্ড!' সহজ হেসেই রমেন সেদিন বলেছিলো, 'গ্রামে থাকিতো! শহরের রীতি কী করে শিখবো বলুন।'

আজ খোলা মাঠের অফুরন্ত উচ্ছলতার মাঝে দাঁড়িয়ে রমেনের

মুখের দিকে চেয়ে কৌশিকের বার বার মনে হলো, বাইরে মানুষটি যাই হোক, হৃদয় ওর সংস্কৃত। এই খোলা মাঠের মতোই মানুষটি স্বচ্ছন্দ উদার।

—কৈ শুরু করুন! আমাকে যেতে হবে এখনি। ব্যস্ত হলো রমেন।

—কবে কোনদিন খেয়াল বশতঃ হয়তো দু-এক লাইন আবৃত্তি করেছি। ওটা এখন থাক রমেনবাবু।

একটু বিমর্ষ দেখালো রমেন চক্রবর্তীকে। —আপনি যখন বলছেন —তবে থাক।

—চলুন, আরো একটু ঘোরা যাক।

—ঘুরবো? —বলছেন!

—হ্যাঁ, চলুন না, ভুরুলিয়ার মাঠটা ঘুরে আসি।

পরেশ মণ্ডল এসে দাঁড়ালো। সংগে চরণ বাগ্‌দী। —বাবু! হাত কচলালো পরেশ।—বলতে সাহস পাচ্ছি নে।

—তোর আবার ব্যাপার কী? তোরা সব ডকে তুলবি! একটু গা-গতর খাটিয়ে কাজ করতে পারিস নে! গম্ভীর হলো রমেন।

—মানে—আমার কিছু তো না —। আমতা আমতা করলো পরেশ মণ্ডল, ওই—মানে—ওরই ছুটি লাগবে। —বাড়িতে—

—তুই নেতা হয়ে বলতে এসেছিস্। টেনে টেনে কথা বললো রমেন।

—না দেবেন ছুটি —ভালো কথা। বিড় বিড় করতে করতে চলে গেলো পরেশ মণ্ডল। চরণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

—দেখলেন? কৌশিকের দিকে তাকালো রমেন।—কী রকম আস্পর্দা! আমি বলে রাখছি দাদা, দেখবেন—এরাই শেষ পর্যন্ত তেস্ মারবে।

কৌশিক রমেনের কথার তাৎপর্য ধরতে পারলো না। চেয়ে রইলো রমেনের কুঞ্চিত মুখের দিকে। তার মনে হলো, কিষাণরা একটু বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। ওদেরকে প্রশ্রয় দিলে ওদের বেয়াড়াপনা

দিনদিন বাড়বেই। ফার্মের সবচেয়ে বড়ো অংশীদার হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাকে একদিন বলেছিলেন, কিষাণদের সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকবেন, কৌশিকবাবু। সুযোগ পেলেই, ব্যাটারা কাজে ফাঁকি দেবে, আদর দিলেই মাথায় চেপে বসবে।' হরেকৃষ্ণবাবুর কথাটায় সেদিন কোনো গুরুত্ব দেয় নি কৌশিক। আজ বুঝলো, এদেরকে স্নেহ করাও যেমন দরকার, প্রয়োজনে শাসনেরও দরকার।

—এই পরেশ মণ্ডলই যত নষ্টের গোড়া। গতবারে এই পরেশই তো হৈ-চৈ বাধিয়েছিলো। আপনি একটু শক্ত হলে আমি এদেরকে টাইট্ করতে পারি—একদিনেই। সঁৎ—সঁৎ করে নস্যি নিলো রমেন। তারপর চরণের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভংগী করলো।

গত মাঘ মাসে পরেশ মণ্ডল কিষাণদের পাণ্ডা হয়ে এগিয় এসেছিলো।—আমাদের সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি দিতে হবে। শান্ত আবেদনের সুরে কথা বলেছিলো।…অংশীদারদের বেশীর ভাগই আপত্তি জানিয়েছিলো। কৌশিক অনেক যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলো—ছুটি ওদের লিগ্যাল ক্লেম। ওরা যদি উপরে আবেদন করে আমরা মুসকিলে পড়বো। কৌশিকের দৃপ্ত যুক্তি ও ব্যক্তিত্বের সামনে আর কেউ আপত্তি করতে পারে নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিলো। তবে সপ্তাহে দেড় দিন নয়, একদিনের ছুটি মঞ্জুর করা হয়। কিষাণরা হাসি মুখেই মেনে নিয়েছিলো। ··সপ্তাহে পুরো একদিন ছুটি পাওয়া সত্ত্বেও আবার ছুটি! না-না-না, ওদের অন্যায় আব্দারকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনো উচিত না। নিজেকে কঠিন করে শানিয়ে তুলতে থাকে কৌশিক।

চরণ মাথা নীচু করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে।

—যা—যা! কাজে যা! দাঁড়িয়ে আর ভনিতা করতে হবে না। ধমক দিলো রমেন।—মেডিক্যাল লীভ ছাড়া অতিরিক্ত ছুটি আর পাবি না।

নড়ে উঠল চরণের দেহটা। ধীরে ধীরে দু'পা গিয়ে আবার ফিরে এলো। মুখ তুললো। কাঁধের গামছার একপ্রান্ত দিয়ে মুখ মুছলো।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, বাবু, ছুটি না পেলি মারা পড়বো, বাবু। একদিনের মাইনে কিটে নেবেন বাবু। কেঁপে উঠলো চরণের কণ্ঠস্বর।

হাত উঁচিয়ে রমেন কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কৌশিক তাকে ইশারা করে থামতে বললো।

—কী হয়েছে তোর? শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো কৌশিক, লক্ষ্য করলো,—ছল ছল করছে চরণের গর্তে-বসা চোখ দুটো।

—বউ আমার পোয়াতি। বুড়ি মা ছাড়া তো বাড়িতি কেউ নাই। এখুন-তখুন অবস্থা। বাবু—! চরণের করুণ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চোখের জল গোপন করবার জন্যই বুঝি মুখ ফিরিয়ে নিলো ও।

—এই কথা! যাবি বৈকি! শিগ্‌গির যা। আর শোন্ টাকার দরকার থাকলে জানাবি। কী বলেন রমেনবাবু—এসব ব্যাপারে নিশ্চয়ই যাবে।

—পেন্নাম হই। প্রায় ছুটতে ছুটতে চললো চরণ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো রমেন। যতক্ষণ চরণকে দেখা যায় ততক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলো। ধীরে ধীরে চরণ অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে কৌশিক চেয়েছিলো রমেনের দিকে। সহসা তাকে চমকে দিয়ে হেসে উঠলো রমেন। তীব্র অট্টহাসিতে নুয়ে পড়লো তার শীর্ণ দেহ। দুরন্ত হাসির বেগে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে সে।

শংকিত বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কৌশিক।

হাসতে হাসতে বসে পড়লো রমেন। হাসির বেগটা ধীরে ধীরে কমে এলো। ফুলপ্যান্ট পরা পাদুটো ঘাসের উপর ছড়িয়ে দিয়ে কৌতুকভরা কণ্ঠে বলে উঠলো। এই সেদিন বিয়ে করলো—এরই মধ্যে ফাদার! আবার হো হো করে হাসলো সে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কৌশিক হালকা করে নিলো বুকটা। কিছুদূরের মরা একটা খেজুর গাছের দিকে চেয়ে কৌশিক উদ্গত হাসিকে দমন করলো। রমেন চক্রবর্তীর দুরন্ত হাসির মধ্যে কৌশিক

সহজ মানুষ রমেন চক্রবর্তীকেই আবিষ্কার করতে চাইলো।

—আপনার সন্তান হচ্ছে কবে, তাই বলুন। রমেনের কণ্ঠস্বরে কোনো জড়তা লজ্জা নেই। কৌশিকের চোখে চোখ রাখলো সে। রূঢ় অমার্জিত কৌতূহল। মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হলো কৌশিক তারপর মৃদু হেসে সহজ হবার চেষ্টা করলো। মৃদুকণ্ঠে বললো, আপনি দেখছি অদ্ভুত মানুষ। ইউ আর ষ্টিল আণ্ডাব এজ।

—তাহলে আসি। পাম্পটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করলো রমেন। চলতে চলতে বললো, বিকেলে আপনার বাসায় বোধ হয় যেতে পারি। বাসায় থাকবেন তো? উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেলো রমেন। চলে গেলো অদ্ভুত মজার মানুষ, কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত সহজ পুরুষটি। লম্বা লম্বা পা ফেলে ফুলপ্যাণ্ট-পরা দীর্ঘ শীর্ণ মানুষটি চলে গেলো।

কৌশিক আপন মনে বিড় বিড় করলো, বিচিত্র, একেবারে অদ্ভুত—

আল ধরে এগোলো সে।

আলুক্ষেতের পরেই বেগুনক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করছে কিষাণরা।

পলাশী সুগার মিলের বাঁশি বাজলো।

ঘড়ির দিকে তাকালো কৌশিক। ন'টা বাজে।

মিলের চিমনি দেখা যাচ্ছে। গল গল করে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে চিমনি দিয়ে।

—কী রে সুলতান, তোব ছেলের খবর ভালো তো?

বেগুনক্ষেতের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়ালো। একমুখ হেসে বললো, হ্যাঁ বাবু। আপনার সেই বড়িতেই ভালো হইছে।

—আজ বিকেলে গিয়ে আরো তুটো নিয়ে আসবি, বুঝলি?

কৌশিক অগ্রসর হলো।

—বাবু, আপনি নাকি চলে যাবেন! সুলতান কখন তার কাছাকাছি এসে পড়েছে।

—কে বললো ? কৌতূহলে ভ্রূ কোঁচকালো কৌশিক।

—এই উরা সবাই বলতিছিলো।

—ও সব বাজে কথা। তোদের ছেড়ে কী সহজে যাওয়া যায়। কৌশিক হাসলো এবং সংগে সংগেই বুঝলো—তার হাসিটা কী কারণে যেন বড়ো ম্লান আর ভারি। বলতে ইচ্ছে করলো, এই মাটি আর এই মাটির বুকে লালিত-পালিত মানুষগুলোকে ভালোবাসতেই তো মীরায় এসেছি। কিন্তু কেন যেন বলতে পারলো না। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো মিলের চিমনির দিকে।

ভালোবাসা মানে কী একটা নিবিড় সম্বন্ধের মাঝে সুখোষ্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করে রোমন্থন করা ? ভালোবাসা কী একটা প্রগাঢ় তৃপ্তির গালভরা নাম ? না, অন্যের ভালোর মধ্যে ধীর স্থির হয়ে শুধু বাস করা ? মাটি আর মাটির মানুষের আকর্ষণেই একদিন কৌশিক কোলকাতা ছেড়েছে। কলেজের অধ্যাপনার মোহ, ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা, পুরোনো বন্ধুদের প্রীতি—সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে একদিন সে ছুটে এসেছে উন্মুক্ত মাটির রাজ্যে, প্রকৃতির শ্যাম সমারোহের মাঝে। কোলকাতার আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে বেশী দিন লাগে নি। অথচ কলেজ, ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধবকে একদিন সে ভালোবাসতো। কিন্তু সে ভালোবাসা গেলো কোথায় ? সেটা কী যথার্থই ভালোবাসা ? না, মোহ ? না, অন্য কিছু।

মাঠ থেকে ফিরতে ফিরতে কৌশিক কেবলি ভাবতে লাগলো, ভালোবাসার সংজ্ঞা কী ? ভালোবাসার প্রকৃত রূপ কী ? তার বাবাও তো দেশকে, দেশের মানুষকে জীবনের অধিক ভালো বাসতেন। কিন্তু সে ভালোবাসা কী তাঁকে ধীর স্থির নিশ্চিন্ত করে তুলেছিলো ? সে ভালোবাসা তো তাকে দুর্দম অশান্ত করে তুলেছিলো। একটা সৃষ্টিছাড়া গতির তরংগে আন্দোলিত হতে

হতেই একদিন তো তিনি হারিয়ে গেলেন অপরূপ গতির রাজ্যে।

সুলতানকে সে বলে এলো, তোদের ছেড়ে কী সহজে যাওয়া যায়! এ তো মায়ামুগ্ধ মোহান্ধ মানুষের কথা। সে কী নিষ্প্রাণ? সে কী স্থির? সে স্পষ্ট দেখতে পেলো—বাবা আর তার মধ্যে আজ বহু যোজন পার্থক্য। একজন গতির দীপ্তিতে স্পন্দমান, আর একজন গতির কল্পনায় তৃপ্ত।

চলতে চলতে তার কেবলি মনে হতে লাগলো, মাটি আর মাটির বুকে লালিত-পালিত মানুষগুলোকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে নিদারুণ অক্ষমতার পরিচয়ই বুঝি দিয়েছে। সত্যিকারের ভালোবাসা মানুষকে গতি দেয়। মানুষকে শক্তি দেয় উদ্দাম হয়ে চলবার। ভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসার অর্থ ভূমাকেই নিবিড় করে পাওয়া।

খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে, বিচ্ছুরিত আলো রং গন্ধের মধ্যে দিয়ে চলবার সময় তার মনের মধ্যে কলরব উঠছিলো। কিন্তু এখন মনটা যেন কেমন এক ধরনের ধূসরতায় আবিল হয়ে উঠছে। এক ধরনের যন্ত্রণা তার উপশিরার মধ্যে মাঝে মাঝে বাজছে।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাবার কথা মনে পড়লো। তখন তার বয়স বারো-তেরো হবে। বাবাকে দেখতে গিয়েছিলো সে হাসপাতালে। সংগে ছিলেন পিসিমা। বাবার চারপাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর কয়েক জন বিশিষ্ট বন্ধু সহকর্মী। বাবা ধীরে ধীরে শীর্ণ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দেশকে দশকে ভালোবাসার মতো বড়ো আর কিছু নেই কুশ। দেশ স্বাধীন হয়েছে। অন্ধকারে সংগ্রামের দিন গত হয়েছে। এখন উন্মুক্ত আলোর রাজ্যে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম। একটু থেমে বলেছিলেন, দেশের এই মাটি আর তার মানুষ বড়ো পবিত্র জিনিস। এদের অমর্যাদা তোর হাতে কোনো দিন হবে না—এ আশা আমার আছে। মাটি আর মানুষকে সত্যিকার ভালোবাসতে পারলে সংগ্রামের ক্ষমতা আপনিই অর্জন করতে পারবি।' —এ সব কথার অর্থ সেদিন সে কিছুই বুঝতে পারে নি। হয়তো ভালোও লাগে নি। শুধু পলকহীন চোখে চেয়েছিলো বাবার দিকে। বাবার রক্তশূন্য শীর্ণ

মুখের উপর এক আশ্চর্য উজ্জ্বল দীপ্তিকে বারবার ছটফটিয়ে উঠতে দেখেছিল। পিসিমার দিকে তাকিয়ে বাবা বলেছিলেন, 'খোকা যদি পথ হারায়, যদি ভুল করে তবে গুরুদেবকে ওর সামনে তুলে ধরবি।' ··তাকে আর পিসিমাকে বাবা আরো অনেক কিছু বলে-ছিলেন, সে সব কথা মনে নেই। মনে করে রাখবার মতো বয়স কিংবা মানসিকতা কোনোটাই তখন তার ছিলো না।

আজ সতের বছরের ওপার থেকে মৃত্যুর কোলে শুয়ে থাকা বাবার শীর্ণ ও উজ্জ্বল দীপ্তিভরা মূর্তিটা বার বার তার সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। স্মৃতির রাজপথ ধরে বাবার সেই কথাগুলো যেন মূর্তি ধরে একে একে এগিয়ে এলো।

মাঠ থেকে এবার পিচের রাস্তায় উঠে এলো কৌশিক। দূর দূর গ্রাম থেকে মানুষ চলেছে মীরা বাজারে। তেহট্ট থেকে বাস আসছে যাত্রীদের নিয়ে চলেছে পলাশী ষ্টেশনের দিকে। খানকয়েক গরুর গাড়িও মালপত্র নিয়ে বাজারে চলেছে!

অন্যমনস্কের মতো রাস্তার এক পাশ দিয়ে কৌশিক চলেছে। মনটা যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। রক্তের মধ্যে যন্ত্রণা এখনো বাজছে।

একটা লরী সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

ধীরে পদক্ষেপে এগিয়ে চললো সে, এগিয়ে চললো কেমন আচ্ছন্নের মতো।

পথ যে ফুরোচ্ছে না! মাঠ থেকে বাসায় পৌঁছাতে মিনিট দশেকের বেশী তো সময় লাগে না। বুঝলো, পা তার চলতে চাইছে না। অনুভূতির ভারটা তাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। একটা রিক্সা পেলে বেশ হতো।

—এই যে, নমস্কার কৌশিকবাবু! মিহি কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো।

চমকে তাকালো রাস্তার পাশের একটা ছোট্ট বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান।

—মাঠ থেকে ফিরছেন বুঝি?

ফুলের বাগানে নীল শাড়ি পরা ভদ্র মহিলার দিকে চোখ পড়লো কৌশিকের।

হাসবার ভান করে কৌশিক প্রতিনমস্কার করলো। —কেমন আছেন ?

—ভালো আর থাকতে পারছি কই ? এ যুগে টিচারদের ভালো থাকা একটা মিরাক্‌ল। খিল খিল করে হেসে উঠলো মহিলাটি।—আপনি কেমন ?

—ভাল নই।

—এই প্রথম শুনলুম আপনি ভালো নন। মৃদু হাসলো মহিলাটি।

রাস্তার দিকে মুখ ফেরাল কৌশিক। একটা রিক্‌সাও চোখে পড়লো না।

—আসি তবে, মিসেস ব্যানার্জি। পা ফেলতে উদ্যত হলো কৌশিক।

—আপনি ব্যস্ত মানুষ। কয়েক মিনিট বসবার সময় নিশ্চয়ই আপনার হাতে নেই।

অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো কৌশিক।

বাগান থেকে বেরিয়ে এলো মহিলাটি।—একটু বসেই যান না—জাস্ট ফর ফাইভ মিনিটস্‌! কৌশিকের দিকে কটাক্ষপাত করলো সে। সাদর সম্ভাষণের সুর তার কণ্ঠে।

রাস্তা থেকে নেমে এগিয়ে গেলো কৌশিক।

বাগানের ঠিক মাঝখানটিতে একটা ছোট্ট বেতের টেবিল ঘিরে তিনটি বেতের চেয়ার।

একটা চেয়ারে ধপ্‌ করে বসে পড়লো কৌশিক। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুললো সে। রক্তের মধ্যে যন্ত্রনার অনুভূতিটা এখনো মাঝে মাঝে জাগছে।

বাড়িটা ছোটো। কিন্তু বাগানটা বেশ বড়ো। বাড়ির সামনে প্রায় চার কাঠা জমির উপরে ফুলের বাগান। সযত্ন হাতের ছাপ বাগানের সর্বত্র। নানা ধরনের ফুলের গাছ। অনেক জায়গা থেকে

সংগ্রহ করা। গোলাপ আর মরসুমী ফুলের রঙের ছড়াছড়ি। বাগানের দুই কোণে দুটি ইউক্যালিপটাস। বিচিত্র মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠেছে বাতাস। দূর থেকে বাড়িটার দিকে তাকালে মনে হয়, ফুলের বাগান সামনে নিয়ে গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটি।

বাড়ির মালিকের কাছেও ফুলের বাগান একটা গর্ব, একটা ঐশ্বর্য। ফুলের কথা উঠলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রেখা ব্যানার্জি। স্কুলের কথা উঠলেও সহজে থামতে চায় না। গর্বভরেই বলে থাকে সে, জীবনে দুটো জিনিস সমস্ত এনার্জি ব্যয় করে রচনা করেছি। স্কুল আমার শক্তি, বাগান আমার আনন্দ।···সত্যি কথা বলতে কী রেখা ব্যানার্জির এ কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই। এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রূপে পাঁচ বছর কাজ করছেন। এই পাঁচ বছরেই শিশু বিদ্যালয়টি যৌবনের আনন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। প্রায় বছর তিনেক হলো বাড়ি আর বাগানটি গড়ে উঠেছে। মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে দিনগুলো বেশ কাটিয়ে দিচ্ছে রেখা ব্যানার্জি। স্বামী মধ্যপ্রদেশে থাকেন। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার তাঁকে মীরায় কেউ কোনদিন দেখে নি। রেখা ব্যানার্জিও যে মধ্য-প্রদেশে গিয়েছে এমন সংবাদ কেউ আজ পর্যন্ত পায় নি।

—একটু বসুন। এখনি আসছি। সকাল থেকে বাগানের মধ্যেই পড়ে আছি।

সারা দেহ দুলিয়ে চলে গেলো রেখা ব্যানার্জি।

কৌশিক এক পলক দেখলো ভদ্র মহিলার হাঁটাটা। মনে মনে কী ভেবে হাসলো। ভদ্রমহিলার বয়স কত, তা বোঝা দুষ্কর। তবে চাল-চলনে বেশবাসে বাইশ বছরের যুবতী হয়েই আছে। অন্ততঃ কৌশিক দুবছর ধরে সেই ভাবেই দেখে আসছে এই মহিলাটিকে।

সেই অনুভূতিটার ঝাঁজ এখন আর বোধ করছে না কৌশিক। ফুলের রাজ্যে বসে কৌশিক যেন অনেক দিন পর নিজেকে সহজ মনে করলো। চারদিকে ফুলের রঙের খেলা। চেনা অচেনা কতো ফুল। তার চোখে ওই ফুলের রং লাগছে কী! ফুলের চঞ্চল

বর্ণবাহারে ছড়িয়ে পড়বার একটা ইচ্ছে জেগে উঠলো। ফুলের মতোই সে ফুটবে, তুলবে, খেলবে, নিজেকে মেলে দেবে। প্রাণভরে সে বাতাস থেকে বিচিত্র মিষ্টি গন্ধটুকু নিজের মধ্যে টেনে নিতে চাইলো।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো রেখা। চেয়ারে বসে বললো, এবার বলুন আপনার কথা।

—আমার কথা! কৌতুকের সুর ফোটাতে চাইলো কৌশিক। আমার কথা অত্যন্ত পুরানো এবং একঘেয়ে। মাঠ-ঘাট আর আমার চাষামির কথা আপনার ভালো লাগবে না।

--এ পথে তো প্রায়ই যাতায়াত করেন। না ডাকলে- তো কোনদিন পদধূলি দেন না। ঘাড় বাঁকালো রেখা ব্যানার্জি।

সহজভাবে হেসেই কৌশিক রেখা ব্যানার্জির দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালো। এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করলো রেখা ব্যানার্জিকে। মোটা লেন্সের ওপারে দুটো কাজল টানা চোখ। ঠোঁটে গাঢ় রং। সারা মুখে পাউডারের মৃদু প্রলেপ। কপালের মাঝখানে এক গাছা কুঞ্চিত চুল। ঘাড় থেকে টেনে তোলা উঁচু খোপা পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে। খোঁপায় পাতাসমেত একটা অচেনা ফুল। হারের লকেটটায় যেন ফুলেরই সতেজ উজ্জ্বলতা। সারা শরীরে একটা ঔদ্ধত্য। মেজে ঘষে বেঁধে শরীরটা একটা চমক-লাগানো শক্ত ছকে খাড়া। মনে মনে স্বীকার করলো কৌশিক—সব মিলিয়ে একটা সুন্দর চটক আছে রেখা ব্যানার্জির। দেহের সম্পদে ও সৌন্দর্যে রেখা ব্যানার্জি ধনী কিনা বলা যায় না, কিন্তু সে যে রূপসী শ্যামাঙ্গিনী একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। নীলার দিকে এমনভাবে কৌশিক এতদিন তাকায় নি। আজ কী একটা কৌতূহল তাকে পেয়ে বসলো। বার বার সে দেখলো রেখা ব্যানার্জির খোঁপা। শাড়ির ও ব্লাউজের সংক্ষিপ্ত হাতার বাইরে পুষ্ট বাহু আর মোটা লেন্সের আড়ালে কাজলটানা স্বপ্নিল চোখের একরাশ প্রগলভতা। তার মনে হলো ফুলের রাজ্যে ফুলের সযত্ন বর্ণ বাহার নিয়েই বসে আছে রেখা ব্যানার্জি।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

রেখা ব্যানার্জি বুকের কাপড়ে হাত দিয়ে হাত নামিয়ে নিলো। বাঁ হাতের চুড়িদুটো উপরের দিকে টেনে তুললো। কানের পাশের চুলগুলো সরিয়ে দিলো। তারপর ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট একটু হাসি ফোটালো।

একটা কিছু বলা উচিত। চঞ্চল হয়ে উঠলো কৌশিক। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললো, ফুলের বাগান নিয়েই ছুটিটা কাটিয়ে দিলেন বেশ। হিংসে হয় আপনাদের দেখে।

বুকে আঁচল ঘন করে টেনে দিলো রেখা ব্যানার্জি। বললো, দিন দশেকের জন্য মধুপুর গিয়েছিলুম।

—মিষ্টার ব্যানার্জির সংগে বুঝি? সপ্রতিভ হলো কৌশিক।

মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হলো রেখা ব্যানার্জি। তারপর শাড়ির প্রান্ত আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললো, একাই গিয়েছিলুম। ওখানে আমার এক ক্লাস-ফ্রেণ্ড থাকে। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সে আবার মামাতো বোনও হয়। সে হাসলো শান্ত গম্ভীর মাপাজোকা হাসি।

কৌশিক চকমকিয়ে রেখা ব্যানার্জির মুখে দৃষ্টি ফেলেই বুঝে নিলো ওর শ্যামলী মুখে দূর অপরিচয়ের একটা ছায়া মসৃণ উজ্জ্বল কপালে একটা রেখা।

—আপনি তো ছুটি-ছাটাতে ঘুরতে যান। কিন্তু আমারতো বাইরে নড়বার উপায় নেই। মাঠ ঘাটের মধ্যে একেবারে চাষা বনে গেছি। নিজেকে এখানে অপরের টানের মধ্যে রেখেছি।

—আপনিই তো এই মাটির খাঁটি সন্তান।

—অতো বড়ো ঠাট্টাটা সইতে পারবোনা, মিসেস ব্যানার্জি। সইবার মতো এত সাহস এখনো অর্জন করতে পারিনি।

—কিন্তু একথা তো স্বীকার করেন—মাটি আর ফসলকে, আলো-

জল হাওয়াকে নিজের বলে ভাবতে না পারলে টাউন আর প্রোফেসারি ছেড়ে আসা সম্ভব হতো না আপনার।

সেই স্তিমিত অনুভূতিটা রক্তের স্রোতে যন্ত্রণার মতো চিনচিনিয়ে উঠছে কী! 'মাটি আর ফসল' আলো-জল-হাওয়াকে নিজের বলে ভেবেছে বলেই বুঝি তৃপ্তির মধ্যে স্থবির হয়ে পড়েছে সে। ঠিকই বলেছে রেখা ব্যানার্জি। অত্যন্ত স্বার্থপর ভোগী হয়ে উঠেছিল সে। বরং কোলকাতার জীবন অনেক ভালো ছিলো। সেখানে প্রতিমুহূর্তে চঞ্চলতা ছিলো। দুঃখ-ভয়-অপমান-নিন্দার মধ্যে একটা অতৃপ্তিকর উৎকণ্ঠা ছিলো। গ্রাম্য প্রকৃতি ও মাটির মধ্যে যে একটা উচ্ছলতা আর অস্থিরতা আছে তাকে সে তার দৈনন্দিন সংসারের শান্তি আর মোহ দিয়ে বুঝি বেঁধে ফেলেছে। সে যদি মাঠ-ঘাটকে ভালবাসতে পারত তবে মাঠ-ঘাটের পরিচয়কে বিস্তৃত করেদিয়ে নিজে তার পিছনে ছুটতে পারত, নিজেকে ছাড়িয়ে দিয়ে কেবলি দুর্বার অস্থিরতা নিয়ে ছুটতে চাইত।

বাগানের গেটের কাছে পায়ের শব্দ বাজলো। চাকর একটা প্লেট আর জলের গ্লাস নিয়ে উপস্থিত।

—একটু মিষ্টিমুখ করুন। চাকরের হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে কৌশিকের সামনে ধরলো রেখা ব্যানার্জি।

—মিষ্টি জিনিষটা ঠিক পছন্দ করিনে, মিস্ ব্যানার্জি। বছর তিনেক হলো মিষ্টি খাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছি।

—কিন্তু মাঠ-ঘাট ঘুরে ক্লান্ত হবার পর এটুকু খারাপ লাগবে না অন্তরংগের মতো কথা বলছে রেখা ব্যানার্জি। —মধুপুকুরের প্যাঁড়া আর বধমানের মিহিদানা। সামান্য একটু নাহয় মুখে দিন। প্লেটটা কৌশিকের মুখের সামনে তুলে ধরলো সে।

সামান্য একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেলো কৌশিক। জিজ্ঞেস করলো, চা-ও করছেন নাকি!

—চা না, কফি।

—ওতে ও মিষ্টি চলবে না কিন্তু।

রেখা ব্যানার্জি হাসলো। কৌশিকের মনে হলো, মিসেস ব্যানার্জির হাসিটা যেন অকারণ, অপ্রাসংগিক।

—মধুপুর থেকে কতকগুলো নতুন ধরনের ফুলের চারা এনেছি। দেখবেন? অদ্ভুত ধরনের পাতাবাহারের কলম এনেছি। দেখতে অনেকটা—

—আচ্ছা, বাগানের মধ্যে থাকতে থাকতে আপনার কখনো কী মনে হয় না আপনি বদ্ধ হয়ে পড়ছেন। কৌশিকের দৃষ্টি আকাশ পরিক্রমা করে বেতের টেবিলে নেমে এলো।

চুপ করে রইলো রেখা ব্যানার্জি। হয়তো কথাটার নিহিতার্থ ধরতে পারলো না। ভ্রূকুঞ্চিত করলো শুধু।

—কখনো কী মনে হয় না আপনি তৃপ্তির মধ্যে স্থির হয়ে যাচ্ছেন, কিংবা সৃষ্টি করতে গিয়ে পুরোণো কিছুকেই তুলে ধরেছেন? কৌশিক বুঝি ভাবস্থ হয়ে কথা বলছে।

—না। বলিষ্ঠ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর রেখা ব্যানার্জির।

কৌশিক যেন চমকে উঠলো। শুনলো, এ বাগান আমার জীবনেব রূপক। আমার আসল জীবন বাইরে কোথাও ধাক্কা খেয়ে অচল হয়ে যাচ্ছিলো। বাগানে আমার নিত্য যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে সেই অচলতাকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছি।

কৌশিক তাকালো রেখা ব্যানার্জির দিকে। শুনলো এক নারীর প্রত্যয়দীপ্ত স্পন্দিত কণ্ঠস্বর, এই জীবনের রূপকেই আমার আসল জীবনকে জাগিয়ে তুলবে। আমার সেই আমির দিকে তাকিয়ে বাগানের প্রাচুর্য আর ব্যাপ্তির মধ্যে কখনই আত্মমগ্ন হয়ে স্থির হয়ে যেতে পারিনে। নিজের হাতে এই বাগান তৈরী করেছি। প্রতিদিন এই বাগানে নতুন সৃষ্টির বেদনা ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাকি।

কৌশিকের নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। কোন নারীর মনের এমন সুস্পষ্ট ভাষণের সামনে মাথা উঁচু করে থাকবার সাহস, এমন কী যোগ্যতাও আজকের কৌশিকের নেই।

—তাই এই বাগানটুকুর মধ্যে আমার চিন্তা, পরিকল্পনা শক্তি

সর্বদা ক্রিয়াশীল। রেখা ব্যানার্জির কণ্ঠস্বর কৌশিকের কানের মধ্যে ঢুকে মর্মে ঘা দিচ্ছিল।—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কৌশিকবাবু আমি এখানে বদ্ধ হয়ে যাই নি। এই বাগানখানি আমাকে বিশ্ব-উত্তরণের মন্ত্র একদিন অবশ্যই শোনাবে। দি গার্ডেন ইজ দি ওয়ে, দি ট্রুথ।

প্রত্যয়দীপ্ত স্পন্দিত কণ্ঠস্বর থামলো।

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেললো কৌশিক।

চাকরটা দু-পেয়ালা কফি এনে রাখলো টেবিলে।

কফিতে চুমুক দিয়ে কৌশিক চকিতে তাকালো রেখা ব্যানার্জির দিকে। শক্ত সমর্থ নারী বলেই ওকে মনে হচ্ছে। বললো, আপনার জীবন যদি ধাক্কা খেয়ে অচল হয়ে থাকে, তবে সেই জীবনের রূপকই তো এই বাগানটুকু। তাহলে বলতে হয় বাগানটা আপনার বর্তমান বাইরেটাকেই ধরে রাখবে। আপনার অচলতাটাই বাগানে রূপায়িত হয়।

—বুঝতে বোধ হয় আপনার ভুল হলো কৌশিকবাবু। আমি যা হতে চাই—সেই জীবনেরই প্রতীক এটা। আমার অনাগত সচলতার বর্তমান প্রকাশ এই বাগানে রূপায়িত-এই কথাটাই বলতে চেয়েছি আমি।

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই কী চলতে চলতে অচল হয়ে পড়ে একদিন? কৌশিক ভাবলো, অচল হয়ে পড়াটাই মানুষের একটা লক্ষণ: শক্তিমান পুরুষ এই অচলতাকে জয় করবার চেষ্টায় জীবন পণ করে। শক্তিবতী নারী কোনো রূপক সাধনার মধ্যে হয়তো সচলতা সমস্ত হৃদয় দিয়ে কামনা করে।

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো রেখা ব্যানার্জি। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বুঝি কৌতুকভরা চোখেই তাকালো কৌশিকের দিকে। মুখে আঁচল চাপা দিয়েই বললো, আপনি দেখছি সিরিয়াস হয়ে পড়লেন। আপনার প্রশ্নে আমি বক্তৃতা দেওয়ার অসম্ভব লোভটা ছাড়তে পারলুম না। কতকগুলো মুখস্ত করা রং-চঙে কথায় আপনি দেখছি ঘাবড়ে গিয়েছেন। নিন, কফিটা জাঁকিয়ে খান দেখি।

অবাক বিস্ময়ে কৌশিক তাকালো রেখা ব্যানার্জির দিকে। কাজলটানা চোখ দুটোতে কেমন রহস্যময় চঞ্চলতা। কপালের মাঝখানে সেই কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ মৃদু মৃদু কাঁপছে। বুকে অতিরিক্ত কাটা জাম রঙের ব্লাউজের ডানদিক নীল শাড়ির আবরণ থেকে খানিকটা মুক্তি নিয়েছে।

আবার খিল খিল করে হাসলো রেখা ব্যানার্জি। হাসতে হাসতেই বুকে আঁচল টেনে দিলো। হাসি থামিয়ে প্রায় স্খলিত স্বরে বললো, আপনার কথা তো কিছু শোনা হলো না। আপনার মাঠ-ঘাট আর সংসারের কথা দু-একটা বলুন।

কফিতে চুমুক দিয়ে কৌশিক বললো, অত্যন্ত সাধারণ একঘেয়ে কথা। আর অত্যন্ত সাধারণ জীবন চলনরে মধ্যে বিন্দুমাত্র অগ্রগতি নেই, যন্ত্রণা আছে কিন্তু রমণীয় বেদনা নেই। আপনার মতো রোমান্টিকতা জীবনে এখনো আসে নি।

—আমার রোমান্টিকতা! কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড় করলো রেখা ব্যানার্জি। চাপাস্বরে বললো, আপনি বুঝি রোমান্টিক হতে চান।

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কৌশিক বললো হলে দুর্বলতার আর অক্ষমতার গ্লানিটা পর্বত প্রমান হয়ে উঠতো না। কৌশিকের কথাটা কেমন করুণ শোনালো রেখা ব্যানার্জির কানে।

একটু গম্ভীর হলো রেখা ব্যানার্জি। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললো, কিন্তু আপনি রোমান্টিক মানুষ এই কথাটা এতদিন ধরে জেনে এসেছি। মাঠের বুকভরা ঐশ্বর্যের মধ্যে দাঁড়ালে অরসিকও কবি হয়ে ওঠে। আর আপনি একটি জ্যান্ত রসময় পুরুষ। আমার মতো ছোটখাটো বাগান নিয়ে তো আপনার কারবার নয়। আপনার সংসারে রসের অভাব আছে বলে তো কোন-দিন মনে হয় না। চটুল ভংগিতে ঘাড় দোলালো সে।

কৌশিকের দৃষ্টি দূরে কোথাও চলেগেলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বললো, দুবছর হলো শহরের কোলাহল থেকে গ্রামের কলরবের মধ্যে আসন নিয়েছি। ইচ্ছেছিলো মাটি, ফসল আর সরল

মানুষগুলোকে ভালবেসে নিজেকে বিস্তৃত করবো। আশংকার চেয়ে আশাটাই ছিলো প্রবল। আজ বুঝতে পারছি—আমার সেই অতি-বড়ো অথচ সরল ইচ্ছেটা আমার দ্বারাই নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। কৌশিক ম্লান হাসলো।—আমার বাবার বিশ্বাস আর আশীর্বাদ আমার বড়ো সম্বল ছিলো। নিজের মধ্যে শক্তিও ছিলো। কিন্তু আমার মায়ের মতো ভোগের আকাঙ্ক্ষা কেমন করে যেন আমার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কৌশিক হাসতে গেলো কিন্তু পারলো না ভারি করুণ আর অসহায় হয়ে উঠলো তার চোখমুখ।

—সৃষ্টির কাজে মানুষের আনন্দ তো স্বাভাবিক। কোথায় যেন পড়েছি—শুকনো শক্ত কাঠে শক্তিনেই, শক্তি আছে মাটিতে লতায় পাতায় ঘাসে ফসলে। রসের আনন্দ থেকে আপনাকে বঞ্চিত বলে ভাবলে আমাদের অবস্থাটা কী রকম হয় একবার ভাবতে পারেন! মনোবৃত্তিটা যেখানে নিজের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে না, সত্যটা সেখানে সোচ্চার। আমি আমার এই এতোটুকুর মধ্যেও নিজেকে কোনদিন নীচু নজরে দেখতে প্রয়াসী হলুম না।

সৃষ্টির ধারণাটা কেমন, সৃষ্টির কাজটা কী—হয়তো তা জানি নে। কৌশিক বুঝতে চেষ্টা করলো রেখা ব্যানার্জির বোঝার মধ্যে কোনো ভুল আছে কিনা। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে বললো, বুঝতে পারছি হিসেব-নিকেশ, লাভ-লোকসান যখন যেখানে জড়ো হয়ে দাঁড়ায়—

—উদ্যম ইচ্ছে সেখানে নষ্ট হতে বাধ্য।

হয়তো যথার্থ বলেছেন! ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয় এককালে গ্রামের মানুষইছিলো সবচেয়ে আনন্দময়। বুঝতে পারি গ্রামের সেই উপকরণ আয়োজন এখনো আছে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রান-ক্রিয়ার যোগ নেই। তখন প্রকৃতিই মানুষকে সংগ্রামের প্রেরণা দিতো। এখনকার গ্রামগুলো, গ্রামের প্রকৃতি মানুষের মনে কেন সংগ্রামের ইচ্ছে জাগায় না! আক্ষেপে ভরে ওঠে কৌশিকের কণ্ঠ।

গো টু ভিলেজ এ কথাটা যদি বিলাসিতা বলে মনে হয় তবে আজ

এতোটুকুও লজ্জিত হবো না। এখানে এসে উপনিষদের মহাবাণী অনুসরণ করে নিজের মধ্যে অন্যকে ও গ্রামকে এবং অন্যেরও গ্রামের মধ্যে নিজেকে পেতে চেয়েছি; কিন্তু কই, আমার প্রকাশ তো হলোনা বীর্যের মধ্যে!

—একটা কথা বলবো মনে যদি কিছু না করেন। সাহস দিচ্ছেন তো? রেখা ব্যানাজির চোখ চশমার আড়ালে পিট পিট করলো।

—বলুন। ব্যগ্র উৎকণ্ঠ উৎকর্ণ হলো কৌশিক।

—সংসারে আপনি অপূর্ণ, শক্তিহীন, এমবিটার্ড।

কেঁপে উঠলো কৌশিক। মনটাও চমকে উঠলো। মুখ নীচু করলো সে। শক্ত করে চেপে ধরলো টেবিলের একটি কোন। বুকটা তার শুকিয়ে গেছে যেন। সারা দেহ আস্তে আস্তে বুঝি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়ছে বুঝি তার চেতনা।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো রেখা ব্যানার্জি। নির্লজ্জের মতো এমন একটা বাজে কথা না বললেই ভালো ছিলো। হয়তো কথাটার অর্থহীনতায় আর অসত্যতায় তাকে ভুল বুঝতে পারে কৌশিক। নিজের প্রতি দুঃসহ ঘৃণায় আর রাগে থর থর করে কেঁপে উঠলো রেখা ব্যানার্জি। নিতান্ত বাচাল মূর্খের মতো কথা বলেছে সে। হয়তো একটা ভুল বিবর্ণ ধারণা নিয়ে ঘরে ফিরবে কৌশিক। হয়তো নাক সিঁটকে ভাববে—মেয়ে মানুষটা আন্‌কালচার্ড, লো-মাইণ্ডেড।

বক্তব্য স্থির করে ফেললো সে। নিজের ভিতরের আড়ষ্টতাকে হাসি দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কণ্ঠস্বরে একটা উচ্ছল আবর্ত তুলে বললো, আপনি জানেন না আপনার শক্তি কী বিপুলতায় উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে। সামান্য একটু চেষ্টা মাত্র দরকার—তাহলে অপূর্ণতার শূন্যতা আপনার পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যেতে পারে। নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখুন। আপনার শক্তির স্পর্শে ধন্য হবার জন্যে কতোজন আপনার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তা আপনি দেখলেন না একদিনও। দেখলে অমন কথা বলতে পারতেন না। কথার

ফুলঝুরি জ্বালিয়ে কৌশিকের অন্তর্লোক দেখবার চেষ্টা করছে রেখা ব্যাণার্জি। মুহূর্তকাল থেমে আবার বললো, মধুপুরে এবার একদিন হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট্ট নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। ঝুড়ি মাথায় এক মজদুর-রমণী নদী পার হয়ে গেলো। হাঁটুখানেক জল তবে স্রোত আছে। আমিও নামলুম। মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে কেন যেন আর নড়তে পারিনে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম। মনে হলো, স্রোত বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ওপারে দাঁড়িয়ে ঝুড়ি নামিয়ে মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসছে। আমি তখন কাঁপছি। তিন-চার মিনিট পরে মেয়েটা জল ভেঙে এগিয়ে এলো। আমার হাত ধরলো। পার হয়ে গেলুম। বিজ্ঞ দূরদর্শী হয়ে উঠলো রেখা ব্যানার্জির চোখ।—সহজকে কতো কঠিন মনে করেছিলুম। সামান্য একটু সাহায্যই পারাবাররূপী গোষ্পদকে পার হতে সাহায্য করলো। সেদিনের সেই আমার সাথে আজকের কৌশিক ঘোষের সাংঘাতিক মিল। ইউক্যালিপটাসের মাথার দিকে তাকালো সে। যেন ফিস্‌ফিস্ করে বললো, সেই সামান্য সাহায্য করবার শক্তি আমার মধ্যেও হয়তো খুঁজে পেতে পারেন। অগ্নিস্ফুলিংগ বিরাট বস্তুর শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। রেখা ব্যানার্জির চোখ বুঝি চক্‌চক্ করছে।

কৌশিক প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ঘড়ির দিকে তাকালো। গম্ভীর হয়ে বললো, পৌনে-এগার বাজে। আর তো দেরী করা চলে না মিসেস ব্যানার্জি।

মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে উঠলো রেখা ব্যানার্জির মুখ। তারপর বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে দুহাত দিয়ে চেপে ধরলো কৌশিকের ডান হাতখানা। করুণস্বরে বললো, বলুন ক্ষমা করে গেলেম কিনা।

কৌশিক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়ালো। আকাশে দৃষ্টি তুলে বললো, আপনার প্রতিটি কথা সত্যি। মিথ্যে ক্ষমার দ্বারা নিজেকে ভারি করে তুলবো না, আপনার অমর্যাদাও করবো না।

তবে বলুন, আমার সম্বন্ধে কী ধারনা নিয়ে যাচ্ছেন।

জানিনে তবে এটুকু বুঝেছি আপনার শক্তি আছে। আর সেই শক্তির গর্ব আপনার বাগানের গর্বকে ছাপিয়ে গেছে। মনে মনে সে বললো, আপনাকে সহ্য করতে পারছি নে।

কৌশিক নিজের হাতখানা দুটি হাতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে বাগান থেকে বেরিয়ে এলো! গৃহকর্ত্রীকে নমস্কার করার কথা সে ভুলে গেছে।

আবার কবে আসছেন?

পেছন না তাকিয়ে উত্তর দিলো কৌশিক, কিছুদিন বিশেষ ব্যস্ত থাকবো।

নীলাকে একবার আসতে বলবেল।

থমকে দাঁড়ালো কৌশিক। নীলা? আজ দশ-বারো দিন হোলো কোলকাতায় গিয়েছে বান্ধবীর জন্ম দিনে। মীরায় ফেরার কথা ভুলেই গেছে। আড্ডা হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে তার দিনগুলো হয়তো চমৎকার কাটছে। আর মীরাতে যে একজন তার কথা যখন তখন ভাবছে সে কথা কোলকাতার স্বচ্ছন্দতার মধ্যে বসে মনে না জাগারই কথা। একজন মীরাতে ম্লান হয়ে আসা আলোর মধ্যে যে শূন্যতা আর নৈসংগ্যের ভার নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তা ভাববার অবকাশ কোলকাতার ফেনিলোচ্ছল উদ্দীপনার মধ্যে অন্যজনের হয়তো নেই।

নীলা বর্তমানে এখানেই একথা বলতে গিয়েও কেন যেন বলতে পারলো না। বললো, আসতে বলবো। এত জোরে বললো যে কৌশিকের নিজের কানই চমকে উঠলো।

কৌশিক পিচের রাস্তায় উঠে জোরে হাঁটতে শুরু করেছে।

পিছন থেকে আর একটা কী কথা রেখা ব্যানার্জি বললো। কিন্তু কৌশিকের কানে সে কথা ঢুকলো না।

নীলার সম্পর্কে কেমন এক ধরণের অনুভূতি তার মনের মধ্যে কিলবিল করছে। স্ত্রীহয়ে স্বামীকে একখানা চিঠি লিখবার সহজ কর্তব্যটুকু কোলকাতার আবহাওয়ায় খুইয়ে ফেললো!

কৌশিকের মন কেমন এক ধরণের নিশ্চল ভারে নুয়ে পড়তে

চাইলো। নীলার প্রতি রাগ বা অভিমান কিছুই জাগলো না। নিজের প্রতি অসহায় ধিককারে ভারাক্রান্ত করে তুললো তার মনের পরিসর।

ট্রেন আসছে। কৌশিকের মনে হলো—তার* ধিকৃত মনের উপর দিয়ে ট্রেনখানি চলেছে।

পলাশী ষ্টেশনে ট্রেনটা গর্জন করে থেমে পড়লো।

কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়লো। রাস্তার এখানটা থেকে প্লাটফর্মটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ষ্টেশনটা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। লোকজন বেরিয়ে আসছে।

ট্রেন ষ্টেশন ছাড়লো। আস্তে আস্তে নির্জন হয়ে পড়লো প্লাটফর্ম।

কৌশিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে আর স্তব্ধ যন্ত্রণার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো নিশ্বাসটা।

ট্রেনের শব্দটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে।

নীলার চিঠি এসেছে। নিজের দুচোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে কৌশিকের। খামের উপরে সেই অতি পরিচিত হস্তাক্ষর। খাম-খানায় আঙুলের স্পর্শ রাখতে ভারি ভালো লাগছে তার। নীলার সম্পূর্ণ হৃদয়টি বহন করে এনেছে চিঠিখানা। কৌশিকের বহু আকাংক্ষার, বহু আসার চিঠি। কৌশিকের মধ্যে এক আশ্চর্য উত্তেজনা। সহসা যেন রাজ্য জয়ের সংবাদ এসেছে। মনে মনে সে বললো, জানতাম চিঠি না দিয়ে তুমি থাকতে পারবে না। চিঠি না দিতে পেরে তুমি অবরুদ্ধ বেদনা দিয়ে কোলকাতার রাত্রিকে কতবার যে আঘাত করেছো, তা আমি এখান থেকেই বুঝতে পেরেছি।

অস্থির ভাবে কিছুক্ষণ পায়চারী করলো সে। একবার সে জানা-লার পাশে দাঁড়িয়ে মধ্যাহ্নের আলোয় উদ্ভাসিত আম জাম কাঁঠালের

বনটিকে দেখলো। দেখলো তালগাছের পাতায় অস্থির আনন্দে কাঁপছে মধ্যাহ্নের আলো। পুকুরটাকে মনে হলো এক নীরব অস্থির আনন্দের প্রকাশ—যে কোনো মুহূর্তে ও জেগে উঠতে পারে। রেডিওটা খুলে দিলো। কোন বিদেশী বেতারকেন্দ্র থেকে অদ্ভুত বাজনার সুর ভেসে আসছে।

ইজি চেয়ারটায় বসে পড়লো সে। খামটা চোখের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলো। প্রায় এক বছর আগে এমন চিঠি সে পড়ছে। হৃদয়ের গাঢ় রঙে ছোবানো খান পঁচিশেক চিঠি। বাপের বাড়ি থেকে নীলা চিঠি দিতো। তারও আগে—বিয়ের মাস ছুয়েক আগে নীলা একখানা চিঠি লিখেছিলো। কৌশিকের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার চেয়ে চিঠি লিখেছিলো ফিফথ্ ইয়ারের ছাত্রি নীলা সরকার।

চোখ বুজে রইলো সে। মনে হচ্ছে বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নীলা। আবেগে থর থর করে কাঁপছে ওর সমস্ত হৃদয়। আর সেই কম্পিত নিবেদিত হৃদয়কে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করছে কৌশিক।

কৌশিক চোখ খুললো। দরজার সবুজ পর্দাটা ছুলছে। ট্রান্স-পোর্ট কর্পোরেশনের ক্যালেণ্ডারটা মৃদু ছুলছে। উত্তর দিকের জানালার কাছে একটা প্রজাপতি বার বার পাকখেয়ে উড়ছে।

ইজি চেয়ারে সোজা হয়ে বসলো সে। শব্দ না করে আস্তে আস্তে ছিঁড়লো খামখানা। চিঠিটা খাম থেকে সন্তর্পণে বের করলো। চিঠিটাতে নীলার চুলের গন্ধ পাচ্ছে। নীলার শাড়ির মৃদু উষ্ণতাও যেন চিঠিটাতে মাখা।

বুকভরে শ্বাস নিলো সে। তারপর চিঠিখানামেলে ধরলো তার একরাশ দৃষ্টির সামনে।

বেশ বড়ো চিঠি। মুক্তোর অক্ষরে নীলা ওর স্বচ্ছ হৃদয়কে পাঠিয়ে দিয়েছে। পাঠিয়েছে জীবনের কবোষ্ণ নির্জনতা আর গভীরতা। আঙুল দিয়ে অক্ষরগুলোকে স্পর্শ করতে চাইলো কৌশিক।

নীলা—প্রিয়তপা নীলা কৌশিকের এই মধ্যাহ্নটিকে কী এক

চেতনায় ভরে দিয়েছে। ভোরের শুকতারার মতো গ্রীষ্মের প্রথম বর্ষণের মতো একটি নিটোল চেতনা তাকে ভারশূন্য ক্লান্তিহীন এক পৃথিবীতে টেনে নিচ্ছে। কতদিন প্রগাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে দুজনে দুজনের চোখে যে পৃথিবীকে উদ্ভাসিত হতে দেখেছে, এ পৃথিবী সেই পৃথিবী। এ পৃথিবী পুষ্পিত প্রলাপের পৃথিবী নয়, পুষ্পিত স্পন্দনের পৃথিবী। তার মনে হলো, সেই পৃথিবীর মাঠে মাঠে ফসলেরা গান গায়। পাখিরা শুধু চলেছে—চলেছে তো চলেছেই। দিগন্তের ইশারায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে প্রাণী। নিত্য মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চলেছে নিত্য জন্মের অভিসার। চিরকালের কৌশিক সেখানে ব্যপ্ত নীলার সংগে লীলায় মেতেছে। সংগ্রামের আবেগ জেগেছে মাটিতে আলোয় হাওয়ায়। একটি বাণীই সেখানকার আকাশকে স্পর্শ করেছে – আমরা আছি। সেই পৃথিবীর এককোণে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রমেন চক্রবর্তী, রেখা ব্যানার্জি আর পিসিমার দিকে মাঝে মাঝে একপলক তাকিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ছে কৌশিক। তার মনে হলো, সে তার হাসির দ্বারা, ইচ্ছের দ্বারা, নিশ্বাসের দ্বারা ওদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। ওদের নিশ্চিন্ত বিলাসের উপর দিয়ে নির্ঝরের বেগে ছুটতে পারে। ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওদের সম্পদের তীব্র অভিমানের উপর। সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিতে ওরা স্থির, সৌন্দর্যের অপূর্ণ বোধে ওরা বিমূঢ়। আবিষ্কারের আবেগে, বোধের দীপ্তিতে তার অবারিত অন্তরাত্মা স্তম্ভিত হয়ে উঠেছে যেখানে যত কিছু ভালো, সেখানেই তার স্পর্শ পড়ছে। ভালোবাসার দুটি চোখ দিয়ে রসের উৎস সন্ধান করছে সে। একটি মাত্র সুর সমস্ত আকাশকে স্তম্ভিত করছে—আমরা আছি। কৌশিক সম্পূর্ণ মানুষের মতো ঋজু মুখরতায় জেগে উঠে বললো, আমি সম্রাট। আর নীলা—

—কার চিঠি রে? বৌমার বুঝি?

বিদ্যুৎবেগে ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কৌশিক। কেমন এক ধরনের ছায়া পড়লো মুখে। ঘরের চারদিকে দৃষ্টিটা একবার

বুলিয়ে নিলো। মৃদু স্বরে বললো, হ্যাঁ পিসিমা।

—কবে আসছে বৌমা? দু সপ্তাহ হয়ে গেলো—

—এখনো পড়িনি। অপ্রতিভ হয়ে বললো কৌশিক।

—ওদের স্কুল তো পরশু খুলছে। এখনো ছেলেমানুষি গেলো না। বৌমার একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই, ছুটিটা এমনিভাবে নষ্ট করলো! এই ছুটিটায় তোরা একটু হৈ-হুল্লোড় করবি আর আমি লুকিয়ে তা দেখবো, তা আর হলো না। মৃদু হেসে কৌশিকের দিকে পিসিমা তাকালেন। তারপর কান পাতলেন রেডিওর দিকে। —কোন্ সেণ্টার দিয়েছিস? গান হচ্ছে না হৈ-চৈ হচ্ছে? পিসিমা দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন।

রেডিও বন্ধ করে দিলো কৌশিক। আবার আরাম করে বসলো ইজি-চেয়ারটায়। কিছুক্ষণ আগে কী যেন ভাবছিলো সে? মনটা কোথায় উড়ে গিয়েছিলো? চিঠিটা বুকের উপর রেখে আশ্চর্য বিষয়বস্তুগুলো ভাবতে চেষ্টা করলো। কিছুতেই একটা কথাও মনে করতে পারলো না।

চিঠিটা চোখের সামনে তুলে ধরলো। তার উদগ্র বুভুক্ষু দৃষ্টি যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তোর মতো অক্ষরগুলির উপর। অনেক কথা লিখেছে নীলা। আনন্দ-উৎসবের মধ্যে ওর দিনগুলো কাটছে বেশ ভালোই। বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, রবীন্দ্র-সরোবর, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, যাদুঘর—সব দেখেছে সে! কোলকাতার অতি পুরোণো জিনিসগুলো দুবছর পর ওর চোখে নতুন হয়ে নাকি ধরা দিচ্ছে। একদিন চন্দননগরেও গিয়েছিলো। ওর প্রতিটি রক্তবিন্দু খুশী হয়ে উঠেছে কলেজ-জীবনের চাঞ্চল্যকে খুঁজে পেয়ে। নীলা লিখেছে, আমি দিশেহারা হয়ে গেছি, হারিয়ে গিয়েছি। তুমি আমার অবস্থায় থাকলে বলতে—মদিরার মতো পান করেছি উচ্ছল সব সংগ! কৌশিকের ইন্দ্রিয়গুলো যেন সংকুচিত হয়ে পড়লো। নিজের কথায় চিঠিটা ভর্তি করেছে নীলা। কৌশিক অদ্ভুত চোখে দেখলো—চিঠিতে সে অনুপস্থিত। যে নীলা কৌশিককে একদিন

দেখতে না পেলে ছটফটিয়ে মরত, বিকেলে একসঙ্গে চা না খেতে পারলে গুমরে বেড়াত, স্কুল থেকে ফেরবার পর কৌশিকের কথা শুনবার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠত, ছুটির দিনে দুপুরে হাসি-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে সময়টা কাটাতে না পারলে মুখ ভার করে থাকত—সেই নীলা নগরীর নাগরিকতার মধ্যে প্রাণের উৎস খুঁজে পেয়েছে—একথা বিশ্বাস করতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে কৌশিক। স্বার্থপর—অত্যন্ত আত্মনিষ্ঠ আত্মমগ্ন নীলা। নির্মম ও সুখ বস্তুটাকে মেয়েরা যে এত ভালোবাসে তা আজ প্রথম বুঝলো সে। বুঝলো, সুখভোগ আর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মেয়েরা যে কোনো পথেই হাঁটতে পারে। আর যারা ইচ্ছেমতো পথে হাঁটতে পারে না তারা ঝড় বহিয়ে দেয় সংসারে। কৌশিকের বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণায় অনুভূতি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। স্থির হয়ে আসছে সমস্ত চঞ্চলতা, নিশ্চল হয়ে আসছে পৃথিবী। পাথরের মতো কী একটা তার বুকের স্পন্দনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। সারা দেহটা দুর্বল শিথিল হয়ে মিশে যাচ্ছে ইজি চেয়ারটায়। কেমন একটা কঠিন পংগুতা তার চেতনার চারপাশে সান্ত্রীর মতো অটল স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ...সারা দেহটা ঝাঁকিয়ে উঠে বসলো সে। যে চিঠিটা তার অবারিত নিসংগতার মাঝে ফুলের মতো ফুটে উঠতে পারত, তা নিসংগতার সহজ পবিত্রতাটুকুও নষ্ট করতে চাইছে। ...চিঠির শেষে লিখেছে বাসায় ফেরার কথা। আগামীকাল বিকেলে নীলা আসবে। ষ্টেশনে কৌশিককে উপস্থিত থাকতেও লেখেনি। ...কৌশিকের বুকের গভীরে সেই সেদিনের মতো একটা অনুভূতি জ্বালা ধরিয়েছে। সেই অক্ষমতার অনুভূতি কেবলি আঘাত হেনে চলেছে।

নিঃশব্দে বার-বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। মধ্যাহ্নের আলোয় জেগে থাকা পৃথিবীটাকে তার মনে হচ্ছে রুক্ষ রূঢ় আর রহস্যময়। ওই পুকুরটা এখন অত্যন্ত নির্জন আর শান্ত। ঘণ্টাদুয়েক আগে কয়েকটি কিশোর কণ্ঠের চীৎকারে ওখানকার শান্তিটুকু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ছিলো। ওখানে প্রাণের হাট বসে গিয়েছিলো। নির্জন

শান্ত পুকুরটা তখন নাচছিলো—দুলছিলো—কী এক অসহ্য আবেগে মেতে উঠেছিলো। এখন শান্ত নিঃসংগতায় স্তব্ধ হয়ে আছে। কেমন উদাসীনতা নিয়ে নিঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে। পুকুরের জলে গাছের ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে হয়তো ছোটো ছোটো আলোর বিন্দু ওর নির্জনতাকে আরো তীক্ষ্ণ ও গভীর করে তুলছে। পাড়ের কাশবনের স্তব্ধতায় একটা ধূসরতা। একপাশে কাশবন নেমে এসেছে জলের কিনার পর্যন্ত।

পুকুরের উত্তর দিকের ধানক্ষেতটার পাশে খানিকটা ফাঁকা জাগায় কতকগুলি গরু চরছে। মেটে রাস্তা দিয়ে সাইকেলে কে যেন চলে গেলো। দুটো কুকুর কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে তালগাছটার পাশে দাঁড়ালো। দুটিতে কিছুক্ষণ গা শুঁকাশুঁকি করলো। আরপর আবার দিলো ছুট্।

কৌশিক বারান্দার কাঠের খুঁটিটা ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথা থেকে রেডিওর গান ভেসে আসছে।

হঠাৎ বাতাসের নিশ্চলতাকে খান খান করে বেজে উঠলো মাইক। হিন্দী গানের চটুল সুরে ভরে উঠলো আকাশ।

অন্যদিন এই চটুল সুরে বিরক্তিবোধ করত কৌশিক। কিন্তু আজ তার মনে হলো, এই চটুলতাটুকু এখন আকাশকে যদি কাঁপাতে না পারত তবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস তার বন্ধ হয়ে যেত হয়তো।

পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না এখন! অনেকদিম পুকুরের জলে নামে নি। মনে হচ্ছে একযুগ ওর জলের স্পর্শ পায় নি সে। ······জলের মধ্যে ছটফটিয়ে বেড়াবে, দুলবে, নাচবে, খেলা করবে। হাত দিয়ে, মুখ দিয়ে জল ছিটাবে—শুধুই জল ছিটাবে, অকারণে অনেকক্ষণ ধরে মাতামাতি করবে, মাঝে মঝে হাসবে, গান করবে। একা ঔদ্ধত্য নিয়ে দাপিয়ে বেড়াবে পুকুরের বুকে। —আঃ! বুকভরে নিশ্বাস নিলো সে। যেন নিবিড় স্বস্তির মধ্যে গিয়ে পড়েছে সে। তারপর? তারপর একসময় ডুববে সে। প্রথমে কিছুক্ষণের জন্যে একটু অস্বস্তিকর যন্ত্রণা। মৃত্যুর রাজ্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে

এগোতে হবে। গতির আবেগে এগিয়ে যাবে সে। অতীতের বঞ্চনা-প্রতারণা, দুর্বলতা-অক্ষমতার ইতিহাসকে পিছনে ফেলে পুকুরের অতলান্ত গভীরে সে এগিয়ে যাবে। যেখানে পৃথিবীর ক্লান্তি স্তব্ধতা নেই, যেখানে চলার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করাটাই বড়ো,—সেখানে সেই নিঃসীম চলার মধ্যে শব্দহীন ব্যাকুল মুখরতার মধ্যে কত সহজে মিলিয়ে যাবে সে। ···পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে কী? এখন কেউ কোথাও নেই। এই তো উপযুক্ত সময়। মধ্যাহ্নের পুকুরের নীরবতাকে ভেঙে ফেলবার মস্ত সুযোগ।

কিন্তু এখন আর ঠিক মধ্যাহ্ন নয়। সূর্য ছাড়িয়ে গেছে মাঝ আকাশ।

মাইকটা জোর বাজছে। গ্রামখানার আকাশে বাতসে হিন্দী গানের সুরটা ছটফট করে বেড়াচ্ছে।

গোয়ালপাড়া থেকে দুটো ছেলে নগ্ন দেহে বেরিয়ে এসেছে কখন। গানের তালে তালে মেটে রাস্তার উপর নেচে চলেছে তারা। একজন কিছুক্ষণের জন্য নাচ থামিয়ে রাস্তার উপরই কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে নিলো।

গোয়ালপাড়া থেকে বেরিয়ে এলো দুটি বৌ। মাথায় ঘোমটা টেনে গুটি গুটি চলেছে পুকুরের দিকে।

হিন্দীগানের চটুল সুর তখনো ছটফট করছে বাতাসে।

উলঙ্গ ছেলেদুটো রাস্তার উপর নেচে কুঁদে সারা হয়ে যাচ্ছে।

বৌদুটো পুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর চারিদিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করে নেমে গেলো ঘাটে। ওরা এখন স্নান করবে। হয়তো সাঁতারও কাটবে। হেসে হেসে জল ছিটাবে না? দাপাদাপিও কী করবে?

কৌশিক হঠাৎ কী ভেবে ঘরের মধ্যে চলে গেলো। পাঞ্জাবী গায়ে চাপিয়ে চটি পরে বেরিয়ে পড়লো।

গোয়ালপাড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললো দ্রুত পায়ে। বেশ ভালো লাগছে হাঁটতে। কেমন একটা অনন্য সুখানুভূতি। পাড়ার

লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কথাবার্তা চেঁচামেচির সুর ভেসে আসছে। বেশ লাগছে এদের জীবন যাত্রার সরব ব্যস্ততাটুকু।

হঠাৎ তার চটিশুদ্ধ একটা পা একগাদা গোবরের মধ্যে ডুবে গেলো।

হি হি করে হেসে উঠলো কয়েকটি ছেলেমেয়ে।

—কী হলো! কী হলো আপনার? ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলো একটা লোক।

কথা না বলে আবার এগোলো কৌশিক।

পিছনে লোকটা বক বক করছে, বউরে রোজ মানা করি। তা কি শোনে? মাগীটার বুদ্ধিসুদ্ধি এট্টু যদি থাকে। বাবুটার কী হলো দ্যাখ দিকি!

পাশের টিউব-ওয়েল থেকে চটিশুদ্ধ পাটা ভালো করে ধুয়ে এগোলো কৌশিক।

গোয়াপাড়া পার হয়ে এসে উঠলো পিচের রাস্তায়।

ফুলের বাগানে কেউ নেই। বাগানের মাঝখানটিতে সেদিনের মতোই একটা বেতের টেবিল ঘিরে তিনটে বেতের চেয়ার। টেবিলের উপর খবরের কাগজ আর পত্রিকা ছড়িয়ে আছে।

ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা।

রেখা ব্যানার্জি কী ঘুমোচ্ছে? সাড়ে তিনটে বাজে। এখনো ঘুমোচ্ছে! বাড়ির আর সব গেলো কোথায়? ওর মা, ভাই, চাকরটা কারোরই যে সাড়া নেই!

কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো কৌশিক। তারপর একপা দুপা করে বাহিরের বারান্দায় উঠলো। দরজা স্পর্শ করতেই খুলে গেলো। খাঁখাঁ করছে ঘরের ভিতরটা। কেউ নেই ঘরে।

কেমন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। এতদূর এসে ফিরে যাবে? গেলো কোথায় সব?

—আপনি!

চমকে পিছনে তাকালো কৌশিক।

—রিয়েলি, আশা করতে পারি নি। একটা খুশীর মূর্তি কথা বলছে। —এমন সৌভাগ্য আমার হবে! ফরচুন হ্যাজ স্মাইল্ড আপন মি! কৌশিকের আপাদমস্তক অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলো রেখা ব্যানার্জি।

কৌশিক কেন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু বক্তব্য খুঁজে পেলো না। আকাশ পাতাল হাতড়েও কথা খুঁজে পেলনা। কেন যে সে এসেছে তা সে নিজেই জানে না। আপন খেয়ালে চলে এসেছে সে। কোনো চিন্তা, কোনো পরিকল্পনা তার ছিলো না। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার বাড়িতে অকারণে খেয়ালের বশবর্তী হয়ে চলে আসা তার মতো মানুষের শোভা পায় না। ভদ্রমহিলাই বা কী ভাববে? কারণ থাকলেও এভাবে আসা খারাপ। দশজনের কাছে এটা দৃষ্টিকটুও হতে পারে। রেখা ব্যানার্জির মা, ভাই, চাকরও একটা কিছু ভেবে বসতে পারে। কৌশিক ঘেমে উঠলো। কী করবে ভেবে না পেয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলো।

ঘরে ঢুকলো রেখা ব্যানার্জি। বললো, আসুন।

কৌশিক ইতস্তত করলো কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর ঘরে ঢুকলো।

—আপনি কতোক্ষণ এসেছেন?

কৌশিক এতক্ষণ পরে একটু হাসলো। বললো, অনেকক্ষণ নয়। বাড়িতে কাউকে দেখছিনে কেন?

—বিনু যে কোথায় গেলো? বাড়ির ভিতর থেকে একবার ঘুরে এলো রেখা ব্যানার্জি। —বিনু হয়তো খেলতে গিয়েছে। চাকর-টাকে সুগার মিলের এ্যাসিস্টেন্ট ইন্‌জিনিয়ার মিঃ চ্যাটার্জির বাসায় পাঠিয়েছি। নতুন ধরনের চন্দ্রমল্লিকার চারা দিতে দিয়েছেন আরতিদি।

—আরতিদি! কৌশিক কৌতূহলী হলো।

—মানে চ্যাটার্জি-গিন্নি। আমাদের বাঁকুড়ারই মেয়ে।

—আপনার মাকে তো দেখছি নে? কৌশিক আস্তে আস্তে রহজ হয়ে উঠছে।

—আপনি জানেন না বুঝি! মা পূজোর আগেই বাঁকুড়া গিয়েছেন। আমাদের পূজা ভেকেশান শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই চলে গিয়েছেন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে! —বসুন।

ঘরের মধ্যে ভালো করে দৃষ্টি ফেললো কৌশিক। ছোট্ট ঘর। ঘরের এক পাশে একটা খাট। অন্যপাশে একটা ছোট্ট টেবিল, একখানা চেয়ার, একটা আলমারী।

চেয়ারটা ঘরের মাঝখানে টেনে আনলো রেখা ব্যানার্জি।

কৌশিক বিছানার উপরই বসলো।

দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, হুইটম্যানের ছবি। আর একটা কার যেন ফটো। কৌশিক ফটোটার দিকেই চেয়েছিলো। রেখা ব্যানার্জি বললো, আমার বাবার ছবি।

—মিলিটারী পোষাক মনে হচ্ছে!

– বাবা শিকারী ছিলেন। ডুয়ার্সে শিকার করতে গিয়েই তো পাহাড় থেকে পড়ে যান। সেই তাঁর শেষ শিকার। রেখা ব্যানার্জি গম্ভীর হলো। —আমাকেই বাবা বন্দুক রাইফেল ছুঁড়তে শিখিয়েছিলেন। বাবা বলতেন—তোকেও শিকারী করে তুলবো। হাসলো সে।—বাঁকুড়া কখনো-সখনো গেলে বন্দুক চালাই।

—বাব্বাঃ, আপনার এতো বিদ্যে! সুটিং, গার্ডেনিং, টিচিং—

—বেহালাও জানি। কশ্চিদ্ রাত্রে বাজাই।

—আজ দুবছর আপনার সাথে আলাপ—অথচ আপনার অনেককিছুই জানতাম না। আপনি দেখছি—

—এবার জানছেন। অন্ধকারের পর্দাটা সরিয়ে ফেলেছি। রেখা ব্যানর্জির মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা। হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে ধরে রেখেই বললো, ইচ্ছে হয়—আমার আকাংক্ষিত অনাগত জীবনকে এই মুহূর্তেই প্রখর আলোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিই।

কৌশিক জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো, বাগানের ঝাউগাছের

দিকে তাকিয়ে বললো, সেদিন আপনার কথা বুঝতে পারি নি। আজ আবার আপনাকে রহস্যময়ী লাগছে। কৌশিকের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

—আপনার সাথে কথা বলতেও ভয় হয়। যখন-তখন সিরিয়াস হয়ে পড়েন আপনি। সেদিন যে ভাবে চলে গেলেন—আমার তো ভয়ই হয়েছিলো--আপনি বুঝি আমার সংশ্রব ত্যাগ করবেন। হাসতে হাসতে চেয়ারে বসলো রেখা ব্যানার্জি।

কৌশিক হেসে উঠলো হো হো করে। হাসি থামিয়ে বললো, পরশুদিন মেজাজটা ভালো ছিলো না। কৌশিকের মধ্যেকার মুহ্যমান অস্বস্তি ঝরে পড়লো।

—দু'দিন আমার রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি দুশ্চিন্তায়। কী জানি আপনার মনে যদি ঘা দিয়ে থাকি। খিল খিল করে হেসে উঠলো রেখা ব্যানার্জি।

কৌশিক রেখা ব্যানার্জির দিকে তাকালো। ওর মুখে আজ পাউডারের ছোপ নেই, ঠোঁটে রং নেই। তবে চোখে কাজলটুকু আছে। একরাশ খোলা চুল বুকে পিঠে ছড়িয়ে আছে। সাধারণ একটা শাড়ি ঘরোয়া ধরনে পরা। এমন সাধারণ মূর্তিতে রেখা বানার্জিকে কৌশিক কোনোদিন দেখে নি। অন্য কেউ দেখলে চমকে যাবে। মীরার সবাই জানে—রেখা ব্যানার্জির চাল চলনে পোযাকে কথা-বার্তায় একটা আভিজাত্যের গর্ব আছে, অহমিকাও আছে। কিন্তু আজকের রেখা ব্যানার্জি নিতান্ত সাধারণ। দেহের সেই শক্ত ছক আজ নেই, কিন্তু ঔদ্ধত্যটুকু পূর্ণমাত্রায় আছে। কৌশিক অবাক হলো না। রেখা ব্যানার্জির সহজ রূপটা ভালোই লাগলো। অন্য দিন রেখা ব্যানার্জিকে কেমন কৃত্রিম বলে মনে হয়। কৌশিক ভাবলো, এমন সহজ মানুষের সংগেই কথা বলে তৃপ্তি পাওয়া যায়।

বালিসের উপর দেহের ভর রেখে কৌশিক অবাধে চোখ মেলে রেখা ব্যানার্জিকে দেখতে লাগলো। এক সময় বলেই ফেললো, আজ আপনাকে নতুন লাগছে।

—আপনাকেও। মনে হচ্ছে—আপনি আজ এখানে এসেছেন কোনো উদ্দেশ্যে। যে ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছেন মনে হচ্ছে আমাকেই খুঁজতে এসেছেন। রেখা ব্যানার্জির মুখে কেমন এক হাসি।

খাটের কাছে চেয়ারটা সরিয়ে আনলো রেখা ব্যানার্জি। জিজ্ঞেস করলো, মাঠ থেকে ফিরছেন, না মাঠে যাচ্ছিলেন?

—বাসা থেকে আজ সোজা আপনার এখানেই এসেছি। মুহূর্তকাল চুপ করে কৌশিক বললো, ভালো লাগছিলো না বাসাতে। তাই দ্বিধা না করে সোজা চলে এলাম। অন্তত আপনার সংগে কথা বলে, ফুলের বর্ণবাহারে একটু লুটিয়ে পড়ে মনটাকে সাচ্চা করে নেওয়া যাবে।

—বাগানে গিয়ে বসবেন?

—এখানেই বেশ আছি।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

রাস্তা দিয়ে বাস চলেছে।

টেবিল ঘড়িটা টিক টিক শব্দ করছে।

কৌশিক মুখ খুললো, একটা কথা বুঝিয়ে বলবেন একটু?

ভ্রূভংগী করলো রেখা ব্যানার্জি।

—আপনার অনাগত জীবনকে এই বাগানের মধ্যে রূপকিত করেছেন, কৌশিক বললো, এ তত্ত্বটি বুঝতে পারিনি। ইন গুড ফেথ বলবেন কিন্তু।

গম্ভীর হলো রেখা ব্যানার্জি। বুকে আঁচলটা ভালো করে টেনে দিলো। আঁচলের প্রান্তটা দিয়ে গলা জড়িয়ে বললো, অন্ধকারের পর্দাটা তো সরিয়ে ফেলেছি। নিজেই ও তত্ত্বটি বুঝতে পারবেন। আমি যতো কিছুই করি না আসলে আমি হলুম একজন নারী। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো সে।—একজন সাধারণ নারী।

কৌশিক চোখ বুঝলো। ।

—একজন নারী যা চাইতে পারে, আমি ততটুকুই চাই। চোখ

খুললো কৌশিক। রেখা ব্যানার্জির মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারলো না সে। চোখ নামিয়ে নিলো। ব্যথা করে উঠলো তার বুকের মধ্যে। রেখা ব্যানার্জির মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে উঠেছে।

রেখা ব্যানার্জিই আবার বললো, অপনার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেও কোথাও যেন ফাঁক থেকে গিয়েছে। সেদিন আপনার কথায় তার আভাষ পেয়েছি। আজকে আপনার দিকে তাকিয়ে সেই আভাষটাই বিশ্বাসে পরিনত হলো।

কৌশিক সর্ব শরীর শিথিল করে বালিসে মাথা রাখলো। বললো, হয়তো ঠিকই বলেছেন মিসেস ব্যানার্জি। আমাদের তুজনের ব্যথার প্রকাশ ভিন্ন রকমের হলেও ব্যথার জন্মক্ষেত্র একই।

আবার তুজনে চুপচাপ।

টেবিল ঘড়িটার একঘেয়ে শব্দ।

জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকছে।

কৌশিক বিছানায় তার দেহটা টান করলো। বললো, মাঝে মাঝে এই ব্যাথাটাকে এ্যানিম্যালিজম বলে মনে হয়। আণ্ডার দি ক্লোক অব আওয়ার এ্যাসথেটিক্ ফিলিংস্ এই এ্যানিম্যালিজম লুকিয়ে থাকে। এ্যাণ্ড উই আর ফোর্সড টু ওয়ারসিপ ইট। উই আর দেন নট এবল্ টু ডিসটিংগুইস গুড ফ্রম ঈভিল।

—এ্যানিম্যালিজম তো সহজাত। ব্যাথা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হলে আবার এই এ্যানিম্যালিজমেরই শরণাপন্ন হতে হবে। এই শরণাপন্ন হওয়ার কায়দাটাই জানিনে। হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো রেখা ব্যানার্জি।—আপনার তো সবই আছে, তবু আপনার এতো শূন্যতা কেন? হোয়াই আর ইউ ইন লো স্পিরিটস্?

—সেদিন তো আপনাকে বলেছি।

—কিন্তু সেটাই কী সব? সংসারে যে সম্পূর্ণ, বাইরে তার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পেতে পারে না। রেখা ব্যানার্জির দৃষ্টি লেন্সের ওপার থেকে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ হয়ে বেরিয়ে এলো।

কৌশিকের বুকের মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি যন্ত্রনার মতো

বাজলো। কৌশিক চোখ বুঁজলো। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে পড়ে রইলো। আপনিই বা একটা রূপক খাড়া করে যন্ত্রনাকে ঢাকবার চেষ্টা কেন করছেন?

—সংসার আমাকে কিছুই দেয় নি। ঋজুকণ্ঠে কথা বলছে রেখা ব্যানার্জি।—দশ বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সংসারের স্বাদ পেয়েছি মাত্র পাঁচ দিন।

কৌশিকের বুকের মধ্যে গুড় গুড় করে উঠলো।

রেখা ব্যানার্জি বলছে,—সেই পুরাণো দিনের কথা, সেই পাঁচ দিনের সংসার যাত্রার কাহিনী ভুলে গেছি। ভোলবার শক্তি পেয়েছি ফুলের কাছ থেকে। ফুলের কাছ থেকেই শিক্ষা পেয়েছি নতুন সংসার সৃষ্টি করবার। শিক্ষা পেয়েছি—প্রেজেন্ট ফোরফ্রন্ট ডিটারমিনস্ দি ওয়ে অব লাইফ, নট ব্যাকসেট ডিটারমিনস দি ওয়ে। তার কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেলো। ফুলের জগতে বসেই উপলব্ধি করেছি—মানুষের সব যায়, কিন্তু ফোটার আবেগ যায় না।

কৌশিক নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে। মন তার সংসার জীবনের মূল্যায়ণ করতে বসেছে। কী পেয়েছে সে সংসারে? আজ দুবছরে নীলা তাকে কতটুকু দিয়েছে, কি দিয়েছে? সংসার তাকে প্রতারণা করেছে বলেই হয়তো বাইরের জীবনে সে অচল হয়ে পড়ছে। ভালোবাসা তো মানুষকে বদ্ধ করে না, বরং বীর্যবানের মতো এগোবার স্বাধীনতা দেয়। ভালোবাসা মানুষকে দাঁড় করিয়ে রাখে না, গতি-মুখর উদ্দামতা এনে দেয়। নীলার ভালোবাসার মধ্যে সে শক্তি নেই। অথচ নীলার কাছেই সে সরল বিশ্বাসে হৃদয় মেলে দিয়েছে। নীলা নিশ্চয়ই তাকে ভালোবেসে বিয়ে করে নি। তার ডিগ্রিকে, তার মর্যাদাকেই ভালোবেসেছিলো। সেই ফাঁকির জন্যেই তো আজ এত ফাঁক, এত শূন্যতা, এত অচলতা। আর সত্যিই যদি সে প্রেয়তপা হত কোলকাতায় গিয়ে তাকে বেমালুম ভুলে উচ্ছ্বাস-উচ্ছলতার মধ্যে লুটিয়ে পড়তে পারত না। নীলার মতো অসত্য, কৃত্রিমতা তার জীবনে আর দ্বিতীয়টি নেই। নীলার প্রতি তীব্র

ঘৃণা আর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তার কেবলি মনে হতে লাগলো, নীলার হাসি-কান্না, আদর-সোহাগ সমস্ত মিথ্যে। তার বুকে মাথা রেখে নীলার নিশ্চিন্ত হওয়ার মধ্যে, ওর আশা-আকাংক্ষা ভরা কথার মধ্যে, আবেগভরা দৃষ্টির মধ্যে প্রাণের পরিচয় কতটুকু? মনে পড়লো তার দেওঘরের ত্রিকুট পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে নীলার স্পন্দিত কথা, 'আমি হবো গান, তুমি হবে সুর।' মনে পড়লো জ্যোৎস্নারাতে পুরীর সমুদ্রতটে বসে নীলার সেই শপথ, 'আমি সাগরের ঢেউ হয়ে কল্লোলিত করবো তোমাকে।' যন্ত্রণায় বুক ফেটে যাবে বুঝি কৌশিকের। সেই বিলাসিনী, সেই মায়াবিনী তাকে পংগু করেছে, তার সর্বস্ব অপহরণ করেছে। সে যদি নির্মম হয়ে বজ্রের মতো এই মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারত নীলার উপর, তবে অন্তরের আহ্বান তাকে টেনে নিয়ে যেত ব্যাপ্তিতে, একটা স্নিগ্ধ প্রসন্নতার মধ্যে মুখর হয়ে উঠত সমস্ত ইন্দ্রিয়। রেখা ব্যানার্জির মতোই সে ভুলে যেতে চাইলো নীলার কথা—জীবন্ত দুঃস্বপ্নের কথা। ভুলে যেতে চাইলো তার জীবনের ভুলকে, তার গত কয়েক বছরের ছন্নছাড়া অতীতকে। কৌশিকের বুকের গভীরে যেন অজস্র কাঁটার যন্ত্রণা। কৌশিক চোখ বুজে যন্ত্রণাকে সহনীয় করতে চাইলো। একেবারে বুকের কাছে থেকে নীলা যা পারে নি, বহু দূরে দাঁড়িয়ে রেখা ব্যানার্জি তা বুঝি সহজেই পারে। যার মধ্যে ফোটার আবেগ আছে, যে অপরকেও ফুটিয়ে তুলতে জানে। সে জানে কেমন করে নব ব্যথাকে ফুলের ব্যাকুলতায় ভরে তোলা যায়। মনে মনে সে আওড়ালো—প্রেজেণ্ট ফোরফ্রণ্ট ডিটারমিনস দি ওয়ে অব লাইফ, নট ব্যাকসেট ডিটারমিনস দি ওয়ে।

কৌশিক নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। না, আর বুঝি সে না। তার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে কী?—আঃ! অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠলো সে। বুকটা চেপে ধরে ছটফট করে উঠলো।

—কী হলো কৌশিকবাবু? বিস্মিত শংকিত হয়ে উঠলো রেখা

ব্যানার্জির কণ্ঠস্বর। দাঁড়িয়ে সে ঝুঁকে পড়লো কৌশিকের মুখের উপর।

—সংসারে যা পাই নি, নীলা যা দিতে পারে নি. কেমন করে তা—

কৌশিক কথা শেষ করতে পারলো না। বুক চেপে ধরে আবার ছটফট করে উঠলো।

—আসুন না, আমরা মুক্ত অন্তরের ডাকে এক সংগে সাড়া দিই। ফিস ফিস করে আবেগস্পন্দিত স্বরে কথা বললো রেখা ব্যানার্জি। বুক চেপে ধরা কৌশিকের ছুটি হাতের উপর হাত রাখলো সে।

—সাড়া তো দিতে চাইছি, পারছি কৈ রেখা দেবী। কৌশিকের স্বর বেদনার্ত হয়ে উঠলো। তার বুকের মধ্যে কী একটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

—রেখা দেবী! রেখা ব্যানার্জির সারা দেহ কাঁপছে।—রেখা দেবী! নতুন সুরে নতুন ভংগীতে কথা বলছে কৌশিক। এক বেদনার্ত মানুষের কণ্ঠে নিবিড় অশ্লেষাভরা ডাক। রিন রিন করে উঠলো রেখা ব্যানর্জির বুক। গভীর স্বরে বললো, একবার আমার দিকে চেয়ে দেখুন। আপনি পারবেন কৌশিকবাবু। আমি আপনাকে --আমি-আমি—। কেমন গভীর হয়ে উঠেছে রেখা দেবীর ছুটি চোখ। গলা তার বুঁজে আসতে চাইছে।

—অতোখানি অধিকার কী সইতে পারবো! কৌশিক ধীরে ধীরে চোখ মেললো।

রেখা দেবীর মাথার চুল কৌশিকের বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছে। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো রেখা দেবীর ছু চোখ দিয়ে। উদাস স্তব্ধতার মধ্যে রেখাদেবী বললো, আমি জানি—অধিকার বহনের বিপুল শক্তি আপনার আছে। সামান্য একটা বিশ্বাসে ভয় করে দশ বছরের জীবন পার হয়ে এসেছি—হয়তো আজকের এই দিনটির জন্যেই। কৌশিকের বুকের উপর নেমে এসেছে তার মাথাটি।

কৌশিকের দুটি হাত রেখা দেবীর একরাশ চুলের মধ্যে ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কেউ কোনো কথা বললো না। কৌশিকের দৃষ্টি জানালা দিয়ে কোথায় ভেসে গেলো। আর নীরব কান্নায় রেখা দেবী ভেঙে পড়লো তার বুকে।

একটা অন্তর্লীন আচ্ছন্নতার মধ্যে উদাস হয়ে কৌশিক ভাবলো, কেমন একটা জানাজানি হয়ে গেলো রেখা দেবীর সংগে। বিচার-বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে কী রকম একটা স্পষ্ট বোঝাবুঝি এইমাত্র হয়ে গেলো। জীবনে এমন অদ্ভুত অনুভূতি আর কারুর জন্যে বুঝি সে বোধ করে নি। এ অনুভূতিটা ব্যাথায় ভরা। অনুভূতিটা পৌষের সকাল বেলাকার আলোর মতো গম্ভীর ও করুণ। কৌশিকের সারা জীবনে এমন অনুভূতির সংগে পরিচয় হয় নি।

বাইরে রোদের তেজ কমে এসেছে।

ইউক্যালিপটাসের শীর্ষ দেখতে পাচ্ছে সে। কৌশিক ভাবলো, আজ বুঝি নতুন বিশ্বাসে স্ফূর্ত হয়ে শীর্ষে ওঠারই পালা। জীবনের ঊনত্রিশটি বছরের অনিশ্চয়তা ও অদূরদর্শিতা পার হয়ে এসে আজ বুঝি তার প্রাণ ফুটে উঠতে চাইছে। রেখা দেবীর মধ্যে দিয়ে আজ সে বুঝতে পারছে---মানুষের সব যায়, কিন্তু অনিবার্য ফোটার আকুলতাটি যায় না।—কিন্তু—

অসময়ে প্রতিকূল ক্ষেত্রে ফোটার যন্ত্রণাও তো কম নয়। থাকুক যন্ত্রণা। এতদিন যখন জ্ঞানে অজ্ঞানে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে এসেছে, তখন আজকের যন্ত্রণা সহ্য করার মতো ক্ষমতা ও অর্জন করতে সে পারবে। নারী হয়ে রেখা দেবী যদি অক্ষেত্রে ফুটে ওঠার তীব্র আকাংক্ষায় জ্বলতে পারে, তবে সে-ও পারবে। সে তো পুরুষ —পৌরুষ তো তার সহজাত। যে কোনো ভ্রূকুটি আর কটাক্ষ সহজভাবে অগ্রাহ্য করবে সে। মনে হলো তার বাবার কথা, তাঁর সেই শক্তির কথা যা কোনোদিন রুদ্ধ হয় নি, সংস্কারের মধ্যে স্থির হয়ে পড়ে নি। যন্ত্রণা আসুক, প্রবল স্রোতের মতো আসুক। এই

সমাজ-সংসারের মধ্যেই, পরিচিত আলো-হাওয়ার মধ্যেই দুজনে ফুটে উঠবে অস্থির আবেগে। ফুটে উঠবে মুক্ত অন্তরের ডাকে। যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই রচনা করবে পথ। যে পথ চলার আগে শুধু বাজবে। যে পথের ধুলোয় একটি স্পন্দিত মহিমাময় জগতের স্বপ্ন ছড়ানো

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো রেখা দেবী। চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কৌশিক উঠে বসলো। জানালা দিয়ে আবার তাকালো বাইরে। ইউক্যালিপটাস আর দেবদারুর গাছ দেখা যাচ্ছে। পিচের রাস্তা দিয়ে কয়েকটা গরুর গাড়ি চলেছে টিম টিম করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো রেখা দেবী। চোখে মুখে জল দিয়ে।

কৌশিকের মুখের উপর স্বচ্ছ দৃষ্টি রাখলো। পরিষ্কার স্বরে বললো, চলুন না, একটু বেরিয়ে আসি রিক্সায়।

কৌশিক দেবদারুর দিকে তাকিয়ে বললো, কোথায়?

—পলাশী ব্যাটল ফিল্ড কিংবা গংগার ধার থেকে।

কৌশিক চুপ করে রইলো।

রেখাদেবী হাসলো মৃদু শব্দ করে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, ভাবছিলুম দুচোখ ভরে শক্তির প্রকাশকে আজ দেখবো।

—কিন্তু সেটা তো এ্যানিম্যালিজম্।

—এ্যাসথেটিক ফিলিংসের আড়ালে তাকে কী পুষে রাখতে চান?

—তা চাই নে।

—তাকে বের করে এনে ভালো-মন্দের প্রশ্নটার একবার উত্তর খুঁজলে হয় না?

—কিন্তু তাতে শুধু দেরীই হবে। চলাটাই তো আজ বড়ো জিনিষ। দুজনে দুজনের চোখে একটি জগতকেই শুধু দেখবো। দুটি জীবনের সংগ্রাম-ব্যাকুলতার মধ্যে দিয়ে এ্যানিম্যালিজম সেদিন বিধি-নির্ধারিত কোর্স নিশ্চয়ই বেছে নেবে। বলবে—মেকওয়ে, মেক ওয়ে, ইউ থোয়টিং ফিলিং। শক্তি নয়, প্রাণের প্রকাশটাই বড়ো।

শক্তির কাঙাল তো আমরা কেউ নই।

—শক্তি এন্‌কারেজড না হলে বর্তমান তো রেহাই দেবে না। সমাজ সে শক্তিকেই ভয় করে, প্রাণকে নয়।

—সমাজ? প্রাণ তো সমাজ সংসারকে বড়ো করে দেখে না। সমাজের চিন্তাটা বড়ো হলে আপনার দুটি চোখের দিকে এমনভাবে তাকাতে পারতাম না। সমাজকেই যদি বড়ো করে দেখেন তবে পারলেন কী করে আমার বুকের উপর লুটিয়ে পড়তে!

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো।

বাইরে পিচের রাস্তায় মানুষের চলাচল।

সূর্য ডুবতে চলেছে। রাঙা আলো এসে পড়েছে দেবদারু গাছে।

বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজ।

—ভাবছিলুম কিছু একটা চাইবো আপনার কাছে। রেখা দেবীর ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা বিস্তার করে মিলিয়ে গেলো।

বাইরে বারান্দায় একটা পদশব্দ উঠলো। পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকলো বিনু। একবার দিদির স্তব্ধ মূর্তির দিকে, আর একবার কৌশিকের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত। তার পরেই ছুটে গেলো কৌশিকের কাছে!

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কৌশিক তাকালো বিনুর দিকে।

বিনু ততক্ষণে চেঁচিয়ে উঠেছে, ইউরেকা, ইউরেকা! আপনি—মানে—কৌশিকবাবু এখানে! সেই কখন থেকে আপনাকে খুঁজছি।

কৌশিকের দৃষ্টি বিস্ফারিত। শ্বাসরুদ্ধকণ্ঠে বললো, আমাকে?

—হ্যাঁ, আপনাকেই তো। আপনি ছাড়া লোক কোথায়? কাল যে আমাদের ক্লাবের নাট্যোৎসব। আপনাকে সভাপতি হতে হবে। বলেই প্রণাম করে বসলো কৌশিককে।—প্রস্তুত থাকবেন। কাল বিকেলে পাঁচটয়ে আপনাকে নিয়ে যাবো আমরা। উঃ! চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়লো সে।—আজ বিকেলে দুবার গেলুম আপনার বাসায়। ঘর দোর তালাবন্ধ। মনে করলুম বুঝি কলকাতায় গেছেন।

বলতে বলতে কেমন অপ্রতিভ হয়ে উঠে দাঁড়ালো বিনু। জিভ কেটে বলে উঠলো, ছি—ছি! কি ভুল! আপনার সামনে চেয়ারে বসেছি! কৌশিকের পায়ে হাত দিয়ে আবার আচমকা প্রণাম করে বসলো সে। বাড়ির ভিতর দিকে যেতে যেতে বেঁচিয়ে উঠলো, তাহলে আপনি কিন্তু রেডি থাকবেন।

নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো রেখা দেবী। 'এবার সশব্দে নিশ্বাস ফেললো। এগিয়ে এসে চেয়ারটা ধরে বললো, বাড়িতে কেউ নেই নাকি?

—বোধ হয় কোথাও গিয়েছে বেড়াতে। কৌশিক বিছানা থেকে নামলো।

—চলি তাহলে। বারান্দায় এলো কৌশিক। কৌশিকের মনে হলো, ফুলের বাগানটা হাসছে। কেমন বিচিত্র হাসি।

রেখা দেবীর দিকে তাকিয়ে কৌশিকও হাসলো। ফুলের বাগানের মতোই বিচিত্র হাসি।

কৌশিক বারান্দা থেকে নামলো। পিছনে একটা ভারি নিশ্বাস পড়ার শব্দ উঠলো।

ছুটতে ছুটতে এসে কৌশিককে ধরে ফেললো বিনু। অনুযোগের স্বরে বললো, চা খেয়ে এলেন না! আপনি চা না খেলে দিদি ভীষণ কষ্ট পাবে। আর রেগেও যাবে খুব। চলুন।

—আর একদিন যাবো। কেমন? কৌশিক এগোলো।

—কিন্তু আমি যে আপনাকে ডুগি-তবলা শোনাবো মনে করেছিলুম। নিরুৎসাহিত হয়ে কথা বললো বিনু।—অনেক বোল শিখেছি।

—তাই নাকি! চলতে চলতে কথা বললো কৌশিক।—আর একদিন শুনবো তোমার বাজনা।

—একটা বোল শুনবেন? খুব ভালো বোল। অপর পক্ষের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই দ্রুত বেগে বলে গেলো বিনু, ধিক্রে ধিনা ধা ধা ধিন্ না ধাতিত্ ধাতিত্ ধা ধা ধিন না তিক্রে তিনা তা তা

তিন্ না ধাতিত্ ধাতিত্ ধা ধা ধিন্ না। আর একটা শুনবেন?

বিরক্ত হয়ে উঠলো কৌশিক। এখন কিছুই ভাল লাগছে না তার। সুস্থ মনে বাইরের কলকোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তার ভাবা দরকার। অনেক চিন্তা, অনেক পরিকল্পনা তার দরকার। বললো, আজ থাক। আর একদিন শুনবো। কৌশিক পা চালালো দ্রুতবেগে।

—নীলাদিকে নিয়ে আসবেন। উনি ডুগি-তবলা শুনতে খুব ভালোবাসেন।

ছুটতে ছুটতে চলে গেলো বিনু।

নীলা! থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো কৌশিক। ও নামটা একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্নের মতো তার মনের মধ্যে বেজে উঠেছে। একটা কাঁটার মতো যন্ত্রণা দিচ্ছে নামটা। নীলা একটা নিষিদ্ধ বিকৃত নাম। নীলা নিষিদ্ধ ক্ষেত্র। নীলা মস্ত বড়ো ভুল, বিরাট মিথ্যে বলেই তো তার এত যন্ত্রণা, তার বুদ্ধির আর সংগ্রামের পথের বাধা। দ্বিধা না করে চলবার স্বাধীনতাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। আজকের আশা তার বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা তাকে দিতে হবে।

কৌশিক অস্পষ্ট আলোয় পিচের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে মনে মনে বললো, রেখা আমাকে আশা দিয়েছে, আমার মধ্যে বিশ্বাস জাগিয়েছে, আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে। রেখা, তুমি আশ্চর্য এক স্বপ্ন।

একটা চলন্ত রিক্সাকে থামিয়ে উঠে পড়লো কৌশিক।

আবছা আঁধারে তখন ভরে গেছে চারিদিক।

হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় এসে পৌঁছালো নীলা। সংগে তার এক বান্ধবীও এসেছে। নাম ঝর্ণা।

নীলা আর ঝর্ণা মাতিয়ে তুললো বাড়িটাকে। কখনো হাসি,

কখনো গুন গুন গান, কখনো-বা পিসিমার সামনে বসে কোলকাতার গল্প।

নীলা বললো, তোমার জন্যে একটা চমৎকার এণ্ডির চাদর এনেছি পিসিমা। আর একটা ফটো নিয়ে এসেছি। তোমরা যখন নারী কল্যাণ সমিতি করতে সেই সময়কার ফটো। ফটোতে তুমি বীণা-পিসি আর কে একজন আছে। বীণা-পিসির কাছ থেকে জোর করে নিয়ে এলাম।

ঝর্ণা হেসে উঠে বললো, আমি শুধু পলাশী দেখতেই আসি নি, আপনার পুরোনো দিনের কথা শুনতেও এসেছি। আর—। চকিতে দৃষ্টি ফেললো নীলার দিকে।—কৌশিকবাবুর মাঠ-ঘাট দেখার ইচ্ছেটাও প্রবল। ট্রেন থেকে নেমেই মনে হলো—ভেরী ইন্টারেস্টিং এ্যাণ্ড লাভলি প্লেস।

পিসিমা নীলাকে জিজ্ঞেস করলেন, বীণা-দির খবর কি? ওঁকে আসতে বললে না কেন, বৌমা!

—বলেছিলাম। কিন্তু বাতের ব্যাথায় কাবু হয়ে পড়েছেন।

ঝর্ণা বললো, কৌশিকবাবুকে দেখছি নে যে!

—শিল্পী পরিষদের নাটক হচ্ছে। সভাপতি হয়ে সেখানে গিয়েছে। ফিরতে রাত হবে। তোমরা রাত না জেগে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো।

গভীর রাতে বাড়ি ফিরলো কৌশিক। ইচ্ছে করেই দেরী করলো। ভোরে উঠে কাউকে কিছু না বলেই বেরিয়ে পড়লো। মাঠ-ঘাট ঘুরে, গ্রাম-সেবক নিবারণবাবুর সংগে জরুরী কয়েকটা কথা বলে সে বাসায় ফিরলো দুপুরে।

দীর্ঘ পুজোর ছুটির পর আজ স্কুল খুলেছে। নীলা স্কুলে গিয়েছে।

স্নান খাওয়া-দাওয়ার পর কৌশিক খবরের কাগজ পড়ছিলো।

ঝর্ণা এসে উপস্থিত।—নমস্কার!

কৌশিক চমকে খবরের কাগজ নামালো। একটুখানি হেসে

বললো, নমস্কার !

—বাড়িতে অতিথি এসেছে—সে খবর বুঝি রাখেন না !

—ভীষণ কাজের চাপ পড়েছে।

—আমাকে চিনতে পারছেন? নীলার বিয়ের সময় পরিচয় হয়েছিলো।

—অনুমান করে নিয়েছি।

—আজ বিকেলে ব্যাটল ফিল্ড দেখতে যাবো। আপনাকে সংগে যেতে হবে কিন্তু।

—কিন্তু—। কৌশিক আমতা-আমতা করলো।

—কিন্তু-টিন্তু না। ইউ মাষ্ট গো, –আমাদের এ্যাকোম্পানি করতেই হবে।

—ভীষণ কাজ, মিস । কৌশিক বিব্রত বোধ করলো।

খিল খিল করে হেসে উঠলো ঝর্ণা। বললো নাম ঝর্ণা বিশ্বাস।

কৌশিক তাকালো ঝর্ণার দিকে। ঝর্ণার চোখে চটুল চাহনি, স্থূল ঠোঁটের কোণে একটা উচ্ছল হাসি স্তব্ধ হয়ে আছে।

কৌশিক বললো, যদি না যাওয়া হয়, মনে যেন কিছু করবেন না।

—করলেও আপনার কিছু আসে যায়-না একটু অপ্রসন্ন হয়েই চলে গেলো ঝর্ণা।

বিকেলে রমেন চক্রবর্তী এলো চীৎকার করতে করতে, বৌদি—বৌদি, কোলকাতা থেকে কী এনেছেন খাওয়ান দেখি।

কৌশিক বললো, রমেনবাবু, আপনি এদের নিয়ে ব্যাটলফিল্ড ঘুরে আসুন। আমি একটা বিশেষ কাজে আটকে পড়েছি।

—আলবৎ। নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো। সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলো রমেন চক্রবর্তী। —আই এ্যাম্ অলওয়েজ এ্যাট ইয়োর সার্ভিস।

একদিন নয়, পর পর দুদিন রমেন চক্রবর্তীর সংগে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র দেখে এলো ঝর্ণা আর নীলা।

হৈ-চৈ আর ঘুরে বেড়ানো নিয়েই কয়েকটা দিন কাটলো।

নানান কলমুখরতার মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কাটতে লাগলো।

কিন্তু কৌশিক নির্লিপ্ত আর গম্ভীর হয়েই রইলো। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, বই আর ফাইল-পত্তর নিয়েই থাকে। কারুর সংগেই খুশীমনে কথা বলবার অবসর যেন তার নেই। কাজের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে যেন।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলায় গান-বাজনার আসর বসে। একটু রাত হলে বসে তাস খেলার আসর। ঝর্ণা, নীলা, রমেন চক্রবর্তী আর পাশের বাড়ির রায়-গিন্নি—এই চারজনে খেলতে বসে।

কৌশিক বাসায় ফেরে রাত দশটা-এগারোটায়।

নীলা সভয়ে লক্ষ্য করেছে—কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে কৌশিক। আগের মতো কথা বলে না। দশটা কথা বললে একটা কথা কখনো বলে কখনো বলে না। আগের মতো হাসে না, চোখ তুলে কারুর দিকে তাকায় না। কারণে অকারণে কৌশিকের সামনে গিয়ে নীলা ঘোরে, এটা নাড়ে—ওটা নাড়ে, পায়ের শব্দ করে। কিন্তু কৌশিকের খেয়াল নেই।

গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীলা। তাস খেলতে খেলতে অন্য-মনস্ক হয়ে পড়ে। সাহেব খেলতে গিয়ে খেলে বসে গোলাম। খিচ মিচ করে ওঠে রায়-গিন্নি। রাত্রিতে সহসা ঘুম আসে না নীলার। কান পড়ে থাকে অন্য কোথাও। গান গাইবার সময় কণ্ঠস্বর হঠাৎ মিইয়ে যায়। স্কুলে গিয়ে অন্যান্য মিস্‌ট্রেসের সংগে কথা বলে না। কোনো মেয়েকে অকারণেই ধমকে দিয়ে বসে। ঝর্ণার সাথে বেড়াতে যেতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করে। রাত্রে ঝর্ণার পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে ছটফট করে। ঘুম আসতে চায়না সহজে। একদিন গভীর রাত্রে সে বিছানা ছেড়ে উঠে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো কৌশিকের খাটের পাশে।···কৌশিকের গা খালি। চাদরটা সরে গেছে গা থেকে। একটা হাত এলিয়ে পড়েছে খাটের বাইরে। নীলার ইচ্ছে করছিলো—ওর গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দেয়। মাথাভর্তি রুক্ষ অযত্ন চুলের মধ্যে তার আঙুলগুলো ডুবিয়ে দেয়।

ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিলো—ওর গায়ে একটু ঢাকা দিয়ে দেয়। খাটের সংগে দেহলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়েছিলো নীলা। কিন্তু সেই মুহূর্তেই নড়ে উঠেছিলো কৌশিকের দেহটা। চকিতে লঘুপায়ে সরে এসেছিলো। বিছানায় এসে একটা উদগতি নিশ্বাসকে সর্বশক্তি দিয়ে রোধ করেছিলো সে। শক্ত আড়ষ্ট হয়ে বালিসে মুখ গুঁজেছিলো। ভেবে পায় নি কেন তার এত সংকোচ লজ্জা ভয়। কৌশিক তো তার অধিকারে সীমা দেয় নি। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে সে—কাজের ভীষণ চাপ পড়েছে বলেই হয়তো তার দিকে তাকাবার সময় পায় না কৌশিক। অভিমান করেনি তো? কিংবা রাগ? আবার ঝর্ণার সামনে সহজ হতেও বুঝি অসুবিধে বোধ করতে পারে কৌশিক। কিন্তু···। আবার প্রশ্ন জাগে। বুকটা ব্যথায় মোচড় খায়। ·· এমন রূপ তো সে কোনোদিন দেখে নি। বাসায় কতবার কতজন এসেছে, কাজের চাপের জন্যে কতদিন উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে কৌশিক। কিন্তু ওর এমন গাম্ভীর্য, আত্মসমাহিত ভাব, এমন রুক্ষ উদাসীনতা তো সে দেখতে পায় নি। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় আর একটা অজানা ব্যথা নিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়েই থাকে নীলা। ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতা আর নীরব কান্নার উদাস স্তব্ধতার মধ্যে কখন সে প্রতিজ্ঞা করে—কাল সহজ হয়ে কৌশিকের সামনে এসে দাঁড়াবে, উচ্ছল করে তুলবে কৌশিককে। কোলকাতায় কেনা নতুন বইগুলো কৌশিকের সামনে রেখে দুষ্টুমির হাসি হাসবে। ঝর্ণা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে তাদের দিকে। ঝর্ণা ভাববে—কত সুখী স্বচ্ছন্দ এরা। এই ক'দিনের উদাস গাম্ভীর্যটুকু ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে। ···কিন্তু পরদিন সমস্ত ইচ্ছে প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না। কৌশিকের গাম্ভীর্যকে রূঢ় মনে হয়। বড়ো কঠিন আর দূরের বলে মনে হয় কৌশিককে। সংকিত নীলার মনে হয়—এমন নির্মম মানুষ আর দুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঝর্ণা বেশ আছে। ঝর্ণার মতোই কলরব তুলে ঘুরে বেড়ায়, তাস খেলে, গান করে। রমেন চক্রবর্তীর কাছে নাগরিক জীবনের সুখ

সুবিধার চিত্র তুলে ধরে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। বলে, আপনারা ওল্ড ফুলিস্, আই মীন চাষা মানে র। রেগে গম্ভীর হতে গিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে রমেন চক্রবর্তী। নীলাকে ডেকে রমেন চক্রবর্তী বলে, শুধু আমাকে নয়, দাদাকেও অপমান করছেন ইনি। কৌশিকের সংগে দু-একটা কথা বলবার সময় ঝর্ণার মনে হয়,—মানুষটি দুর্বোধ্য, বিবাহিত জীবনে বুঝি অসুখী।

বাসায় যতক্ষণ থাকে কৌশিকের মনে হয় যেন বদ্ধপুরীতে সে আছে। ঝর্ণার হাসি বদ্ধ মনেরই হাসি। নীলার দৃষ্টি অংগসঞ্চালন কণ্ঠস্বর রহস্যময় বদ্ধ সংসারের প্রতারণাটুকুই শুধু বিলিয়ে চলে। গোপনে নীলার দিকে তাকিয়ে তার বার বার মনে হয়েছে, ও মিথ্যে, ও কৃত্রিম, ও অভিশাপ। মনে হয়েছে নীলা তাকে বুঝি মায়ায় ভুলিয়ে রিক্ত শূন্য করে বদ্ধ অন্ধকারে রেখে দিতে চায়। মনকে তৈরী করতে থাকে সে। পালাতে হবে তাকে। নীলার বদ্ধ দৃষ্টির বাইরে, মায়া আর প্রতারণার বহু দূরে। দুর্বার তেজস্বিতা, দুর্জয় সাহস নিয়ে এই বদ্ধ ছলা-কলার মধ্যে জেগে উঠবার জন্যে একটা অস্পষ্ট তাগিদ অনুভব করে সে। কিন্তু কেন যেন পরে একটা অধৈর্য উদ্বেগ বোধ করে। মনে মনে চিন্তা করে রেখা দেবীর মুখখানা, পুরুলেন্সের আড়ালে উজ্জ্বল চোখদুটোর কথা। চিন্তা করে --ফোটার আবেগকে রূপ দেবার জন্যেই বুঝি স্বামীর ঘর ছেড়েছে রেখা দেবী—মায়া আর মিথ্যের রাজ্যে বাস করবার মতো মোহ ওর মধ্যে নেই। থাকলে ফুলের বর্ণ বৈচিত্রের মধ্যে রেখাদেবী এমন চঞ্চল হয়ে উঠতে পারত না। রেখার মতো সাহস আর আত্মবিশ্বাস অবলম্বন করতে হবে তাকে। তারপর একদিন গিয়ে দাঁড়াবে রেখা দেবীর পাশে পথের ধুলায়। পাশাপাশি চলবে ছুটতে ছুটতে। চলবে বাঁধনহারা পথের আনন্দে। —প্রতিদিন বিকেলে সে গিয়ে উপস্থিত হয় রেখা দেবীর বাড়িতে। গল্প করে, হাসে, চিন্তা করে। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে বিহ্বল হয়ে। উভয়ে উভয়ের চোখে খোঁজে তাদের স্বপ্নের জগৎকে। কখনো রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডস্-

ওয়ার্থ, সেক্সপীয়র থেকে আবৃত্তি করে কৌশিক। মুগ্ধ হয়ে শোনে রেখা দেবী—ওর মুখের উপর কেমন একটা উজ্জ্বলতা জেগে ওঠে। রেখা দেবী কখনো বেহালা বাজায়। কৌশিক যেন ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। তার মন সুরের ডানায় ভাসতে ভাসতে চলে যায় কোথায় কোন দূরে। মন অনবরত ছবি আঁকে। রেখা দেবীর হাত কখনো কাঁপতে থাকে, কখনো-বা ঋজুতায় খেলা করে। ছড় ঘুরতে থাকে। সুর বেরিয়ে আসে সমুদ্রের গর্জনের মতো, দক্ষিণের মৃদু বাতাসের মতো। মৃদু হাসির শব্দ বা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ তুলে কোনো কোনো সময় সুরটা চারদেয়ালের মধ্যে কেবলি পাক খেতে থাকে। মাঝে মাঝে বিনুর তবলা বাজানো শুনতে হয়। বাজানোর হাত বেশ ভালো। অপরের দেখে শুনেই নিজে নিজে বাজাতে শিখেছে বিনু। বাসার মধ্যে বন্দী থাকতে এতটুকুও ভালো লাগে না কৌশিকের। এতটুকু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের বাতাসকে বুকের গভীরে টেনে নিতে পারে না। আজ ক'দিন পিসিমার দিকে তাকিয়ে কৌশিকের কেন যেন মনে হচ্ছে—পিসিমা বুঝি একটা নিষ্পত্র গাছ—সতেজও নয়, মুমূর্ষুও নয়, দীনতা বা সৌন্দর্য কোনোটাই নেই। কেন যেন মনে হচ্ছে—মীরা গ্রামটি কেবল কক্ষচ্যুতই নয়, অক্ষচ্যুতও হতে চলেছে।... সকালে মাঠে গিয়ে কিষাণদের সংগে কথা বলে। অধিকাংশ কথার অর্থ বুঝতে না পেরে কিষাণরা হাঁ করে চেয়ে থাকে তার দিকে, দু-একবার বোকার মতো হাসে। মাঠের কোনো গাছের তলে বসে কৌশিক চেয়ে থাকে শূন্যে কিংবা পলাশী চিনি কলের চিমনির ধোঁয়ার দিকে। খোলা মাঠের মধ্যে বসে মাঝে মাঝে একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজে—এই মাটি আর কিষাণদের সংগে তার সম্পর্কটা কতদূর সত্য, কতখানি বাস্তব? উত্তর খুঁজে না পেয়ে নখ দিয়ে মাটি খোঁড়ে, টেনে টেনে ঘাস ছেঁড়ে। শুধু একটি কথাই মনে হয়—সংসার-জীবনে সে ব্যর্থ। আর এই ব্যর্থতার জন্যেই সম্পর্কের মধ্যে থেকে কোনো সুন্দর মহিমময় ছবি বুঝি জেগে ওঠে নি। আকাশে ডানামেলা পাখির দিকে তাকিয়ে, স্পন্দিত শস্যক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে তার

কেবলি মনে হয় রেখা দেবীর কথা, তার ফুল বাগানের কথা। ভেবে মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে—ছড়ের আঘাতে একটা কঠিন যন্ত্রণা কেমন হাসতে হাসতে বেজে ওঠে বেহালার তারে। ভেবে মন খুশীতে ভরে ওঠে—তার নিজের ভিতরের অসহনীয় দ্বন্দ্বকে সরিয়ে সরিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে রেখা দেবী। তার আহত জীবনের ভিতর থেকে ফোটার যে আবেগ মূর্ত হয়ে উঠতে চাইছে তার মূলে রয়েছে রেখা দেবীর অন্তরের স্পর্শ। এই স্পর্শ বুঝি জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্তে নতুনত্ব দান করে, নতুন সংসার রচনার শক্তি দান করে। উপভোগ সম্ভোগের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি এখানে নেই। এখানে শুধু সৃষ্টির বর্ণাঢ্যতা, ধুলোর রাজ্যেও অভিনব মোহন চঞ্চলতা।…নীলাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলাটাই আজ তার কর্তব্য। খোলা মাঠের মধ্যে বসে অথবা ফুলের গন্ধে বিহ্বল হয়ে তার মনে হয়—নীলাকে পিছনে বহু যোজন দূরে সামান্য একখণ্ড পাথরের মতোই ফেলে এসেছে। মাঝে মাঝে ভেবে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—তার চোখে মুখে বেশ বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠেছে। সংস্কার, রীতি-নীতি সে গ্রাহ্য করে না। ভাবে—তার স্বপ্ন কল্পনা আকাংক্ষা এক আমিত্ব থেকে আর আমিত্বে অভিসার করেছে। আর নীলা পিছনে অসহায় জড় স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে।

—নমস্কার কৌশিকবাবু। চললাম।

কৌশিক চমকে উঠলো। ঝর্ণা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

ঝর্ণা হাতঘড়ির দিকে চকিতে তাকিয়ে বললো, পলাশীতে এসে অনেক কিছু নিয়ে গেলাম। দুটি নোতুন জিনিস পেলাম—ব্যাটল-ফিল্ডের মনুমেণ্টের কাছে বসে নিঃস্বতা আর আপনার কাছ থেকে রুক্ষ অচলতা। হোপ ইউ উইল টেক মি ইন গুড পার্ট।

কৌশিক জোর করে হাসলো। কণ্ঠে মৃদু বিদ্রূপ তুলে বললো, নিঃস্বতা আর রুক্ষ অচলতাকে ভেদ করাই তো আপনার কাজ হওয়া উচিত ছিল। ভেদ করতে পারলে পলাশী ছেড়ে হয়তো যেতে চাইতেন না।

হো হো করে হেসে উঠলো রমেন চক্রবর্তী। ঘরের এক কোণে

মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো নীলা।

কৌশিক টেবিলে আঙুল দিয়ে শব্দ করলো। বললো, ফোটার আগে একটা নীরবতা জাগে, জানেন তো?

দ্যাটস্ ইয়োর বিজনেস্। বাট টু মি ইটস্ ইনকম্প্রিহেনসিবল্। চলি তাহলে। চলুন রমেনবাবু। ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবেন। জুতোর খট খট শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলো ঝর্ণা। চেঁচিয়ে বললো, আপনি আহ্বান না জানালে আসবো না।

মাটির বুকে পাথরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা বুঝি। কিন্তু এটা তো স্বাভাবিক নয়। মাটির ছেলে মাটির মতোই সহজ ও সুন্দর হবে। মাটি আর প্রকৃতিকে যে সত্যিই ভালোবাসে তার মধ্যে রুক্ষতা কাঠিন্য আসবে কেমন করে? পিসিমার অন্তরাত্মা যেন চমকে উঠেছে। চিরবিপ্লবী তাঁর দাদার এমন রূপ তো কোনোদিন ছিলো না। ভীরু বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন পিসিমা—তাঁর হাতে গড়া, তাঁর বুকের মাধুর্যে লালিত-পালিত কৌশিকের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। কৌশিক কোথায় চলেছে? সংসারকে অগ্রাহ্য করতে চাইছে কী? মায়ের মতো ও সংসারের নির্যাস পান করতে চায়, আবার বাবার মতো সংগ্রামকেও ও রক্তের স্পন্দনে জাগিয়ে রাখতে চায়—এমন ধারণাই পিসিমা করে এসেছেন। কিন্তু সে ধারণা পালটে যাচ্ছে। দাদার বিপ্লবী-জীবন সম্পর্কে বৌদি কি ধারণা করতেন তা তিনি জানেন না। কিন্তু এটুকু জানেন সংসারকে দাদা ভালোবাসতে পেরেছিলেন বলেই দেশ তাঁর কাছে ছিলো অত্যন্ত প্রিয়। ক্ষুদ্র সংসার-জীবনের সম্পূর্ণতাই দাদাকে বৃহৎ সংসারের মধ্যে গৌরবান্বিত করেছিলো। কিন্তু কৌশিক বংশের রক্তধারা আপন দেহে বহন করেও এমন উদ্‌ভ্রান্ত হবে কেন? যে কৌশিক মাটি আর মাটির মানুষের সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যকে নিজের করে দেখে, যে কৌশিক নীলার চোখে চোখ রেখে,

প্রাণের দীপ্তিতে হাসে, যে কৌশিক সংসারের আলো হাওয়ায় তার পিসিমাকে আলোর মতো জাগিয়ে রাখে,—এই কৌশিক সেই কৌশিক নয়।

ঠাকুর ঘরে বসে পিসিমার দুটি চোখ জলে ভরে গেলো। ঠাকুর-পূজো করতে একটুও মন বসছে না তাঁর। মনে মনে বললেন, ঠাকুর, আমি তো এই কুশকে চাইনি। সাতাশ বছর পর আমার কুশকে কেন কেড়ে নিচ্ছো তুমি? কুশকে সরিয়ে নিয়ে তোমাকে বর্ণহীন কোরো না ঠাকুর! একটা কান্নাভেজা দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়লো তাঁর বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে।

পরশুদিন রমেন চক্রবর্তী দুঃখের সংগেই তাঁকে বলেছে, দাদা আজকাল কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। কাজকর্ম দেখাশোনা করেন না বললেই চলে। শেয়ার-হোল্ডারদের অনেকেই তাঁর ব্যাপার দেখে খুঁত খুঁত করছেন। বহু কাজ পড়ে রয়েছে। কিছু বললে চুপচাপ থাকেন।

আজ সকালে নীলাকে পিসিমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুশের কী হয়েছে বৌমা।

—জানিনে পিসিমা। বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নীলা।

—তুমি লুকোচ্ছ বৌমা। পিসিমা গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। —কুশের সংগে তোমার কী মন কষাকষি হয়েছে? তুমি কুশকে ব্যথা দিয়েছো?

মুখ নীচু করে প্রায় স্খলিত স্বরে নীলা বলেছিলো, তাকেই সব জিজ্ঞেস করবেন পিসিমা।

পিসিমা কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন, সামান্য অভিমান, ছোট, একটা ভুল মানুষের জীবনকে তছ্‌নছ্‌ করে দিতে পারে—এ তোমাদের জানা উচিত বৌমা। ঠাকুর কী বলেন জানো—

পিসিমার বুকে মাথা রেখে হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিলো নীলা। কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেছিলো, আজ ছ' মাসের বেশী হলো আমার সংগে কথা বলেননা। কথা বললেও জবাব দেন না।

নিশ্বাস বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পিসিমা নীলার কথা শুনেছেন, আমাদের রেখাদিই ওকে বদলে দিয়েছে। রেখাদির তুলনায় আমি যে অতি নগণ্য পিসিমা। কান্নার আবেগে ফুলে উঠেছিলো নীলার দেহ।

নীলার মাথায় হাত রেখেছিলেন পিসিমা। তাঁর দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো দেয়ালের উপর। অনেকক্ষণ পর বলেছিলেন, এমন ভেঙে পড়লে তো চলবে না বৌমা। তোমাকে সাহসী হতে হবে। তুমি যে কুশের আনন্দের দূতী। তোমাকে কুশের সমস্ত জিজ্ঞাসার মহত্তম উত্তর হতে হবে বৌমা। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কোরো। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে শক্তি দেবেন। মনে মনে ইষ্টনাম জপ করলেন পিসিমা।

নীলাকে উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করলেও তিনি নিজে যেন দমে গেলেন। তাঁর মনে হলো—তাঁর এতদিনের আশা বিশ্বাস শান্তি সব মিথ্যে। মিথ্যে তাঁর সংসার-রচনার আপ্রাণ প্রয়াস।

ঠাকুরঘরে বসে তাঁর মনে হলো—তাঁর সাধনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো ফাঁকি আছে। নইলে কৌশিকের পথ ভুল হবে কেন! মনে মনে স্মরণ করলেন—মৃত্যুশয্যায় শায়িত দাদার কথা। পথ ভুল করলে বা হারালে কৌশিকের সামনে তুলে ধরতে হবে গুরুদেবকে। কেন না ভালোবাসা আর সংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক তিনি। গুরুদেব তাঁকে পুণ্য করেছেন, তাঁর দাদাকে গতি দিয়েছিলেন। আজ তিনিই পারেন কৌশিককে পথ দেখাতে, সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-চালনায় উদ্বুদ্ধ করতে।

রাত বারোটার সময় কৌশিক ফিরলে পিসিমা আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালেন তার সামনে।

ধীরকণ্ঠে বললেন, রোজ রোজ এতো রাত করে ফিরিস কেন?

—তোমাদের কী অসুবিধে হয়?

—অসুবিধের কথা বলছি নে। এতে ঘরের মানুষের স্বস্তি থাকে না।

—কিন্তু আমার এতেই স্বস্তি। ঘরে আনন্দ কোথায়?

পিসিমার মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটলো। ধীরকণ্ঠেই বললেন, অস্বীকার করতে পারবি নে যে সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিতেই আনন্দের অভাব। তোর জানা আর করার মধ্যে ভুলও তো থাকতে পারে।

কৌশিক চুপ করে রইলো।

পিসিমা বললেন, তুই বৌমাকে মিছে কষ্ট দিচ্ছিস কুশ।

কৌশিক শব্দ করে হাসতে চাইলো। কিন্তু ঘরখানা চমকে উঠবে বলে চুপ করে গেলো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

—তোর সমস্ত আশা-আকাংক্ষা আদর্শ নিষ্ঠা পিছনে ফেলে এ তুই কোথায় চলেছিস কুশ? শুধু বৌমাকে নয়, নিজেকেই তুই কষ্ট দিচ্ছিস। পিসিমার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো।

—যদি বলি এই ঘর মায়া আর ছলনা বিস্তার করে পংগু করতে চাইছে আমাকে, আমার চলাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে—। কৌশিক মুহূর্তের জন্যে থামলো। শ্বাস নিয়ে হ্যারিকেনের আলোর দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি তো জানো—আমার মা সংসারকে নিবিড় করে পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাই বলে বাবাকে শক্তিহীন করতে চান নি।

—বৌমাকে তুই ভুল বুঝেছিস কুশ। সে তো তোকে আবদ্ধ করতে চায় না।

—আমার ভুল নিয়েই আমাকে থাকতে দাও পিসিমা।

—আমাকে তো তুই তাই বলে দুঃখ দিতে পারিস না।

—তোমার আবার দুঃখবোধ আছে নাকি! কৌশিক কেমন এক অপরিচিত সুরে হাসলো।—তুমি তো স্থির শান্তির মধ্যে মগ্ন হয়ে আছো। চেয়ার আর খাটের মতোই তো তুমি অচল।

পিসিমা চমকে উঠলেন। তাঁর দৃষ্টি যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো। কৌশিকের কণ্ঠস্বরে এ কিসের ধ্বনি? এ কী অবজ্ঞা, ঘৃণা, না বিদ্রূপ? কৌশিক যদি তাঁকে অপমান করত তবে হয়তো তাঁর বুকে এত জোর লাগত না। এ কী সেই কৌশিক যে পিসিমার কোলে

মাথা রেখে পিসিমাকে ব্যাকুল করে তুলত। পিসিমার সারা শরীর শক্ত আড়ষ্ট হয়ে যায়। কৌশিককে চিনতে এই মুহূর্তে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কী এক রূঢ় মিথ্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখেছে কৌশিক।

অনেকক্ষণ পরে পিসিমা হাসলেন। কেমন করুণ আর উদাসীন সেই হাসি। থমথমে চোখে তাকালেন কৌশিকের চোখের দিকে।

জানালা দিয়ে চৈত্রের এক ঝলক চঞ্চল হাওয়া ঘরে ঢুকলো। কেঁপে উঠলো হ্যারিকেনের শিখা। একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো।

পিসিমা বুকের কষ্টকে চেপে নিজেকে কঠিন করতে চাইলেন। নিষ্কম্প কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, এ সংসারে আমার মূল্য হয়তো ফুরিয়েছে, কিন্তু আমার কাছে সংসারের মূল্য যে অনেক। সংসারে যদি ফাঁক থাকে আমার শান্তির মধ্যেও তবে ফাঁকি থাকবে। সেটা তো আমি সইতে পারবো না কুশ। সাতাশ বছর ধরে একটা আশাই শুধু পোষণ করেছি—তুই হবি মাটির প্রকৃত সন্তান, সংসারের আলো-আঁধারের মধ্যেই তোর ভিতরের মুক্ত মানুষটি একদিন ফুটে উঠবে। একটু থেমে বললেন, রূঢ় সত্যকে অস্বীকার করে নিজেকে ভুলিয়ে রাখা যায়, কিন্তু ভিতরের মানুষটি তার ফলে অত্যন্ত ছোটো হয়ে পড়ে।

মনে মনে হাসলো কৌশিক। বললো, বাইরের খোলা মেলা জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি কথাগুলো বলতে, তবে শুনতাম। ঘরের অচলতার মধ্যে কথাগুলো ভালো লাগবে না। কৌশিকের কণ্ঠে আবার সূক্ষ্ম বিদ্রূপের ঝিলিক।

পিসিমা চোখ বুঁজলেন। ইষ্টনাম জপলেন মনে মনে। আকুল-কণ্ঠে বললেন, তুই ফিরে আয় কুশ। আমি যদি অচলই হয়ে থাকি তবে আঘাত দিয়ে আমাকে সচল করে তোল। তোর আঘাত আমি মাথায় পেতে নেবো। বৌমাকে শাস্তি দিতে চাস—পালিয়ে গিয়ে নয়, সংসারে থেকেই যতো পারিস শাস্তি দে। হাসিমুখে বৌমা তা গ্রহণ করবে।

বলতে বলতে পিসিমা এগিয়ে গেলেন। কৌশিকের পিঠে হাত রেখে প্রার্থনার সুরে বললেন, আমার অন্তরে যে ঠাকুরই থাকুন, আমার চোখের সামনে তুই-ই তো ঠাকুর। তোকে কোনোদিন অশ্রদ্ধা করি নি। আজও করবো না। তুই ফিরে আয়। তোর ভাবী সন্তানের দিকে চেয়ে শুধু একবার ফিরে আয়।

কৌশিকের সর্বাংগ কেঁপে উঠলো। হ্যারিকেনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

—তুই ফিরে এসে তোর বাবার মতো স্বীকার কর—এ সংসার আমার। তারপর ছুটে বেরিয়ে যা। আমরা কেউ বাধা দেবো না। পিসিমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ কান্নার ভারে যেন পিষ্ট হলো। জলে ভরে গেলো তাঁর দুটি চোখ। প্রায় চুপি চুপি স্বরে বললেন, আর একবার আমাকে বিশ্বাস করতে দে তোর ভিতরের মুক্ত পুরুষটি সংগ্রামের মধ্যেই জেগে উঠতে চায়।

কিছুক্ষণের জন্যে দুজনেই চুপচাপ।

কৌশিক নির্নিমেষে হ্যারিকেনের দিকে চেয়েই আছে।

পিসিমা অনেকক্ষণ চেপে রাখা একটা দীর্ঘনিশ্বাস সশব্দে ত্যাগ করলেন।

কৌশিক পিসিমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো তাড়াতাড়ি।

বাইরে চৈত্রের হাওয়া তালগাছের পাতায় শব্দ তুলেছে। রান্না-ঘরের পাশে নিমগাছের পাতায় মৃদু শন্ শন্ শব্দ উঠেছে। কোথায় একটা বিড়াল ডেকে উঠলো।

হ্যারিকেনের শিখাটা কয়েকবার কেঁপে উঠেই দপ্ করে নিভে গেলো। রাজ্যের অন্ধকার যেন হুড়মুড় করে ছুটে এলো ঘরটাতে।

পিসিমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো অবিশ্রান্ত ধারে। এই অন্ধকারেই তিনি কাঁদতে চান। কেঁদে কেঁদে বুকটাকে হাল্কা করতে না পারলে দম বন্ধ হয়ে বুঝি মারা যাবেন। বহুদিন, বহুদিন তিনি কাঁদেন নি। আজ কাঁদবার মস্ত সুযোগ। তাঁর এই কান্না কৌশিকের

ভুল আর গ্লানিকে ধুয়ে নিয়ে যেতে কী পারে না ?

অন্ধকারে কৌশিক বলে উঠলো, তোমাদের জীবন দিয়ে আমাকে বিচার করতে এসো না। তোমরাও কষ্ট পাবে, আমাকেও বিরক্ত করবে। আর শোনো,—ভাবছি এ কাজ ছেড়ে আবার কোল-কাতাতেই ফিরে যাবো।

মুহূর্তকাল বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন পিসিমা। তারপর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

পাশের ঘরে তখন পিসিমার বিছানার উপর নীলা মুখ গুঁজে পড়ে আছে। একটা চাপা কান্নার উদাস স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে থমকে আছে যেন।

ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন পিসিমা। আসনের উপর স্তব্ধ হয়ে বসলেন তিনি। বাইরের অন্ধকার রহস্যের মতো তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো।

……তাঁর জীবন দিয়ে কৌশিককে কী বিচার করতে গিয়েছেন তিনি ? এ কী বললো কৌশিক ?

চোখ বুঁজে আত্মস্থ হতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু পারলেন না। অন্ধকার যেন তীব্র হয়ে তাঁকে চেপে ধরলো।

……চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ডাক্তার সেনের মূর্তি।

—আজ কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি নে। আমার কোয়ার্টারে আজ না গেলে ভীষণ দুঃখ পাবো। ইউ মাষ্ট গো। বলে হাত ধরে নিজের গাড়িতে অনিলা দেবীকে তুলে দিয়েছিলেন ডাক্তার সেন।

ডাক্তার সেনের বাসায় তাঁর বৃদ্ধা মা, একজন চাকর আর একজন রাঁধুনী। আর কেউ নেই।

ডাক্তার সেন বলেছিলেন, বাসায় থাকতে একটুও ভাল লাগে না। আজ কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে এমন সুন্দর সন্ধ্যা জীবনে আসে নি।

অনিলা দেবী লক্ষ্য করেছিলেন,—চক চক করছিলো ডাক্তার সেনের বড়ো বড়ো চোখদুটো। ঠোঁটের ফাঁকে কেমন এক

রহস্যজনক হাসি।

সেদিন সারারাত ডাক্তার সেনের বাসাতেই ছিলেন অনিলা দেবী। একই ঘরে একই বিছানায় ডাক্তার সেনের সংগে রাত কাটিয়ে সকালবেলা পুঞ্জীভূত ক্লেদ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন নারীকল্যাণ সমিতিতে।

ডাক্তার সেন বলেছিলেন, আই অয়াণ্ট ইউ—অয়াণ্ট টু এনটার ইনটু দি ম্যারেড ষ্টেট।

আর একদিম ডাক্তার সেন বলেছিলেন, সোসাইটিতে মর্যাদা পেতে হলে আমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার তো আর গতি নেই অনি। রিমেমবার, ইউ আর গোয়িং টু বি এ মাদার। ডোণ্ট ডিলে অনি।

অনিলা দেবী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিলো, বিয়ে করলে সমাজ তাঁকে রেহাই দেবে না। দাদার সম্মানই বা কতটুকু রইবে! অবৈধ সন্তানকে অবৈধভাবেই সরিয়ে ফেলতে হবে। মুহূর্তের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন তিনি।

ডাক্তার সেন বলেছিলেন, ইফ ইউ ওয়াণ্ট মি, টেক মি। ইফ নট, গো ইয়োর ওয়ে।

মন স্থির করে ফেলেছিলেন অনিলা দেবী। ছুটে চলে এসেছিলেন দাদার কাছে। দাদা বলেছিলেন, আমি সব জানি রে অনি। আমার গুরুদেবের কাছে যা। পথ বাতলে দেবেন তিনি।

দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। জীবনের পথে নিজে চলবার ও অপরকে চালাবার দক্ষতা অর্জনের তীব্র অভিলাষই সেদিন তাঁর মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছিলো।……

ডাক্তার সেনের স্মৃতিটা আজ আর সহজ হয়ে উঠলো না। তাঁর বুকের মধ্যে বার বার খোঁচা মেরে তাঁকে কাঁপিয়ে তুলতে লাগলো।—উঃ! অস্ফুট শব্দ করে বুকটা চেপে ধরলেন পিসিমা।

…ছোট্ট কৌশিক তাঁর দিকে তাকিয়ে ছোটো ছোটো হাত নেড়ে বলছে, পিতি—পিতি—আ—আ

বুকে জড়িয়ে ধরেছেন ছোট্ট কৌশিককে।

কৌশিককে নিজের করে না নিতে পারলে তাঁর জীবনে শান্তি নেই। মনে মনে বার বার বলেছেন, কুশ আমার। সে আমার শূন্য নিঃস্ব জীবনকে পূর্ণ করতেই এসেছে। কিন্তু বৌদি থাকতে—

একটা কঠিন ভয়ংকর দুঃসাহসে নিজেকে বদ্ধ করেছেন অনিলা দেবী। একটা নিষ্ঠুর সংকল্পের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনকে শানিয়ে তুলেছিলেন তিনি। একদিন সুযোগ এলো। অসুস্থ হয়ে পড়লেন বৌদি। গোপনে ওষুধে বিষ মিশিয়ে দিলেন তিনি।...

আর্তনাদ করে উঠলেন পিসিমা। তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডকে দুহাত দিয়ে কেউ পিষ্ট করছে বুঝি।

দুহাত দিয়ে নিজের বুককে চেপে ধরলেন।

যে সব স্মৃতি তাঁর নিরুদ্বিগ্ন সহজ জীবনে অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিলো, সেইসব স্মৃতিই আজ তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো।

বেলা চলে যাচ্ছে গাছ-পালার আড়ালে। দিনের শেষ আলো আধখোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে।

কৌশিক বাইরের বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে বসে চেয়ে চেয়ে দেখছে ভাদ্রের মেঘলা আকাশকে। দূর পশ্চিমের রোদ মেঘলা আকাশে এখনো মাখানো।

পুকুরের দিকে তাকিয়ে এখন আর ভাবাবিষ্ট হয় না সে। এখন আর তার মনে হয় না,—পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে নতুন অনুভূতি লাভ করি। মনে হয় না—মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মহাসুন্দর বা মহিমময় কোনো জগতে গিয়ে পৌঁছাই।

বাসার সামনে বৈদ্যুতিক আলোর একটা থাম বসেছে। কিছুদিনের মধ্যেই এই পাড়ায় বিদ্যুতের আলো আসবে। তারই তোড়জোড় চলছে ক'দিন ধরে।

থামের মাথায় বসে একটা পায়রা পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজছে বার বার। রাঙা আলোর মৃদুচ্ছটা পায়রার স্বাভাবিক বর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

থামটার দিকে তাকিয়ে কৌশিক ভাবলো জগৎ জুড়ে পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনশীল জগতে তার ওপর রয়েছে রূপান্তর। জীর্ণতা প্রতিমুহূর্তে নতুনত্ব পাচ্ছে। জীব-জগতে প্রকৃতি-রাজ্যে নিত্য নতুন ভাঙা-গড়ার আয়োজন। এই সদাচঞ্চল গতিময় পৃথিবীতে সেও খোলস ছেড়ে ফেলে তাকে নিয়ে নতুন উচ্ছ্বাসে অধীর হতে চাইছে। তাকে সম্পূর্ণ রিক্ত করে আবার পূর্ণ করতে চাইছে।

নীলা আজ তিন মাস হলো মা-বাবার কাছে গিয়েছে। বাসা প্রায় ফাঁকা। পিসিমা রান্নাঘর আর নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। বাসাতে নিশ্চিন্ত হয়েই এখন সময় কাটায় কৌশিক। তাকে অস্বস্তি আর বিরক্তিতে ভরে দেবার এখন আর কেউ নেই।

গতকাল চিঠি এসেছে কাঁচরাপাড়া থেকে। লিখেছেন তার শ্বশুরমশাই, নীলা একটা পুত্র-সন্তান প্রসব করেছে। সন্তানকে নিয়ে প্রসুতি ভালোই আছে।—কথাটা চিন্তা করে কৌশিক মনে মনে হাসলো। কোনো আনন্দ, কোনো দুঃখ কিংবা কোনোরূপ দুশ্চিন্তা তো সে অনুভব করছে না! সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে নতুনভাবে পূর্ণ হবার মুখে এটা হয়তো কোনো সংবাদই নয় তার কাছে। তার নিজের পৃথিবীর কাছে এটা হয়তো অতি ক্ষুদ্র সামান্য একটা ব্যাপার মাত্র। একমাত্র বিরাট বিপ্লবই এখন তার কাছে খবর হয়ে উঠতে পারে।

সংবাদটা শুনে পিসিমা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুরঘরে বসে অনেকক্ষণ পুজো করেছেন। পাড়ার অনেককে বাসায় ডেকে এনে মিষ্টি খাইয়েছেন।

রমেন চক্রবর্তী এক হাঁড়ি মিষ্টি কৌশিকের সামনে নামিয়ে রেখে চীৎকার করে বলেছিলো, নাউ ইউ আর এ ফাদার আই কনগ্র্যাচুলেট অন ইয়োর গ্রেট গ্লোরি।

অঞ্চল পঞ্চায়েতের স্থানীয় বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পোষ্ট মাষ্টার, ষ্টেশন মাষ্টার এসে আনন্দ প্রকাশ করে গিয়েছেন। আরো অনেকে এসেছেন শুভকামনা নিয়ে।

কৌশিক আবার মনে মনে হাসলো। বিড় বিড় করে বললো,

যতো সব !

চায়ের কাপ নিয়ে পিসিমা এসে দাঁড়িয়েছেন।

কৌশিক চায়ের কাপটা নিয়ে সামনের ছোটো একটা টুলের উপর নামিয়ে রাখলো।

পিসিমা দাঁড়িয়ে রইলেন। কৌশিকের মনে হলো—কিছু একটা বলবার জন্যে উসখুস করছেন বুঝি পিসিমা।

চায়ে চুমুক দিলো কৌশিক।

মেটে রাস্তার পাশের তালগাছটা থেকে একটা তাল পড়লো।

পিসিমা বললো, ভাবছি একবার কাঁচড়াপাড়া থেকে ঘুরে আসি। তোর ছেলেকে দেখবার জন্যে মনটা ভীষণ ছটফট করছে। বেয়াই মশাইও যেতে লিখেছেন।

কৌশিক মনে মনে হাসলো। গম্ভীর কণ্ঠে বললো ; এই সামান্য ব্যাপার আমাকে বলছো কেন ! চায়ে চুমুক দিয়ে পিসিমার দিকে একবার কটাক্ষ করলো সে। ঠোঁট কামড়ে বললো, ছোটাছুটি করার ইচ্ছে তোমার আবার কবে জাগলো ? তোমার স্থির জগতে বেশ তো নিশ্চিন্তে আছো। হাসিটা ঠোঁট টিপে চাপলো কৌশিক।

মুহূর্তকাল চুপ থেকে পিসিমা স্খলিত স্বরে বললেন, শিগগিরই আমি গুরুদেবের কাছে যাবো। তুই আমার যাবার ব্যবস্থা করে দে কুশ।

কৌশিক চায়ে চুমুক দিলো। আবার চুমুক দিলো। আবার—আবার।

পিসিমা দাঁড়ালেন না ব্যস্ততার সংগেই ঘরে চলে গেলেন।

কৌশিক উঠে দাঁড়ালো। বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কয়েকবার পায়চারী করলো।

সূর্য ডুবে গেছে।

বৈদ্যুতিক আলোর থামটা যেন নিঃসংগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মাথা থেকে পায়রাটা উড়ে গেছে কখন। থামটার দিকে তাকিয়ে কৌশিক আপনমনে বলে উঠলো, সবাই গেলে আমি বাঁচি। এই

শান্ত নিষ্প্রাণ পুরী থেকে ছুটে বেরোতে দিচ্ছো না তো তোমরাই।

সূর্য ডুবলেও দিনের আলো তখনও শেষ হয়ে যায় নি।

—কে? কী ব্যাপার?

কৌশিক দেখলো রেখা দেবীর বাড়ির ঝি-টা এসে দাঁড়িয়েছে।

—আপনাকে যেতে লাগবে। দিদিমুনি বুলছেন। ঝি-টা একবার ফিক্ করে হেসেই চলে গেলো।

নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকলো কৌশিক।

বিছানার দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

চোখ বুঁজে শুয়ে আছে রেখা দেবী। শিথিল হাত দুটো খাটের বিছানায় ছড়ানো। দুটি পা আভংগ—শৈথিল্যে যেন লুটিয়ে পড়েছে। পরণে লাল শাড়ি। আঁচল বুক থেকে সরে গিয়েছে ঘাড়ের নীচে। খোলা চুল বালিশে বিন্যস্ত। কালো-কালো আর হলদে-হলদে ছাপমারা সাদা রঙের জামাটা অতিরিক্ত টান টান। ঈষৎ স্থূল ঠোঁটে বুঝি রং মাখানো। চোখে আজ চশমা নেই। বোঁজা পাতায় কাজলের মৃদু আভাষ। সারা মুখে একটা সুস্পষ্ট উচ্ছলতা দেহের অনম্র ঔদ্ধত্য ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের আলোয় প্রকট হয়ে উঠেছে।

রুদ্ধশ্বাশে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কৌশিক। তারপর কেমন লজ্জাবোধ করলো। খুক করে কেশে চেয়ারে শব্দ করে বসলো।

রেখা দেবী চোখ মেলেছে। আবার চোখ বুঁজে তেমনি ভাবেই শৈথিল্যে পড়ে রইলো।

কৌশিক আবার কাশলো। পায়ের গোড়ালি দিয়ে মেজেতে শব্দ তুললো।

রেখা দেবী একটুও নড়লো না।

এবার অস্বস্তি বোধ করছে কৌশিক।

—কী হলো আপনার? অস্বস্তিভরা ব্যস্ততা নিয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করলো।

চোখের পাতা কয়েকবার পিট পিট করলো রেখা দেবী। উঠে বসলো না, নড়লোও না।

কৌশিক চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে রেখা দেবীর কাছে খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো।

কৌশিকের দিকে চেয়ে কেমন অদ্ভুত হাসলো রেখা দেবী। চুপি চুপি স্বরে বললো, দেখুন তো গা গরম কিনা।

রেখা দেবীর কপালে হাত রাখলো কৌশিক।—কৈ না তো!

—আপনি ছাই দেখতে জানেন। কেমন একটু ফিবারিশ ফীল করছি। বলে কৌশিকের হাতখানা টেনে নিয়ে তার বুকের উপর চেপে ধরলো রেখা দেবী। বললো, এবার দেখুন।

কেমন একটু হকচকিয়ে গেলো কৌশিক। থতমত খেয়ে বললো, কই—মানে তেমন কিছু—মানে—গ-গ—

কৌশিকের কথা আটকে গেলো।

রেখা দেবীর ঠোঁটে ঈশৎ হাসির আভা। কাজল-টানা চোখ দুটি যেন নিবিড় রহস্যে ভরা। কৌশিকের হাতখানা বুকের উপর সজোরে চেপে ধরে রেখা দেবী গাঢ়স্বরে বলে উঠলো, জ্বর আমার কোথায় বুঝতে পারছেন না! ঠোঁট কামড়ে ফিস ফিস করে বলে উঠলো, অন্য যে কোনো পুরুষ আমার রোগটা ধরতে পারতো। আপনি বোগাস্।

কৌশিকের হাতটা কাঁপছে। তার সারা দেহ ঘামতে শুরু করেছে।

কৌশিক চোখ বুঁজলো। তাকালে দেখতে পেত—কী এক অদম্য ইচ্ছে নিয়ে রেখা দেবীর ঠোঁটদুটো কাঁপছে। আর কেমন এক আবেগে গভীর হয়ে উঠেছে কাজল-চোখদুটো।

পাষাণের মতো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো কৌশিক। তারপর ছিটকে দূরে সরে এসে দাঁড়ালো।

চকিতে উঠে বসেছে রেখা দেবী। আঁচলটা টেনে তুললো বুকের

উপর। কৌশিকের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, আপনি এতো ভীরু! সমাজ-সংসারের বুকের উপর দিকে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবেন—এমন শক্তি আপনার আছে? যেন শানিতকণ্ঠে কথা বলছে রেখা দেবী।

—দোহাই! কৌশিক প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো।—এমন করে সব ওলোট-পালোট করে দেবেন না!

—কিন্তু—কিন্তু আমি যে বাঁচতে চাই, আমি যে ফুটতে চাই! আমি যে প্রকৃত নারী হয়ে থাকতে চাই! ক্ষোভে হতাশায় কেঁপে উঠলো রেখা দেবীর কণ্ঠ। দুহাতে মুখ ঢাকলো সে।

খাট থেকে নেমে ধীরে ধীরে কৌশিকের সামনে এগিয়ে এলো রেখা দেবী। হাঁটু গেড়ে বসে কৌশিকের পা জড়িয়ে ধরলো। প্রায় রুদ্ধ স্বরে বললো, আমার এতোদিনের বাসনা সাধনাকে নষ্ট করে দিও না কৌশিক। বলেই কান্নায় ভেঙে পড়লো রেখা দেবী।

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। বিদ্যুৎ চমকালো। পর মুহূর্তেই ভেসে এলো মেঘের গর্জন।

কেমন অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো কৌশিক। তার সারা শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে আসতে থাকে। কান্নায় ভেঙে পড়া রেখা দেবীর দিকে চেয়ে একটা ব্যথা জাগলো তার বুকে। ব্যথাটা তাকে ব্যাকুল করতে চাইলো। কেন যেন তার বার বার মনে হলো —সারা জীবনটা বুঝি সে পেরিয়ে এলো আজকের এই দিনটির জন্যেই। বলতে চাইলো, আমি তোমাকেই চাই রেখা। তোমাকে নিয়েই ফুলের ঐশ্বর্যে ঘর বাঁধতে চাই। পথ চাই নে, পথের সংগ্রাম চাই নে। তুমিই আজ বাস্তব। তোমার স্বপ্নে দেখা বাসাই আজ সত্য। আমরা ফুটেছি নিরালায়। কেউ জানবে না, জানতে চাইবে না—আমরা কেন ফুটেছি, কী ভাবে ফুটেছি। তার মনে হলো—এই ঘরখানা এই মুহূর্তে যেন ফুলের বাগান হয়ে উঠেছে।

তীব্র বিদ্যুৎ চমকালো। কোথায় ভীষণ গর্জন করে বজ্রপাত হলো।

কৌশিক হঠাৎ ভিতরে চমকে উঠলো।...এ কী করতে চাইছে সে! এতদিনের প্রতিজ্ঞা কী এইটুকুর জন্যে! মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাবার মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

সংগে সংগে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো সে।

বাইরে তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

নীরবতা যে মুখরতার চেয়েও পীড়াদায়ক তা সর্বপ্রথম অনুভব করলো কৌশিক।

সামনে সন্তানকে বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে নীলা। ওর চোখদুটো সজল হয়ে উঠেছে।

কৌশিক একভাবে চেয়ে আছে খোলা দরজার দিকে। না পারছে কথা বলতে; না পারছে সরে যেতে।

এগিয়ে এলো নীলার দাদা অনিমেষ। গগলস্‌টা চোখ থেকে নামিয়ে পকেটে রেখে বললো, আপনি দেখছি আমার মতন। আমরা এলাম কোনো অভ্যর্থনা নেই, বিনয় এবং খুশীর আড়ম্বর নেই।

কৌশিক লজ্জিত হলো। লজ্জিত হাসি হেসেই বললো,নমস্কার!

– না—না, ওটুকুও নয়! আমার সইবে না। হো হো করে হাসলো অনিমেষ।—দেখেই বুঝতে পারছি ভালোই আছেন। আপনার চাষবাসের কথা বলুন।

—দাদা—দাদা! চীৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকলো রমেন চক্রবর্তী!—এঁ্যা! বৌদি? ইউ—মানে মাই গ্রেট বৌদি। কখন এলেন?

—এই মাত্র। একটু হাসলো নীলা। তারপরেই গম্ভীর হয়ে পড়লো।

গম্ভীর হলো রমেন চক্রবর্তী। বললো, এই যে সাত মাস দাদার

কী ভাবে কেটেছে শুনলেন আপনি—। অনিমেষের দি:কে তাকিয়ে চুপ করে গেলো সে। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, উনি কে বৌদি?

—আমার দাদা।

—ও—আপনিই সেই লোন্ ট্রাভেলার! বিস্ময়ে আনন্দে চোখ বিস্ফারিত করলো রমেন চক্রবর্তী। -- আপনার কথা বহু শুনেছি। কাগজে আপনার ছবি দেখেছি। যাক্, ভালোই হলো—আপনার কাহিনী শুনে নিজেদের ধন্য করবো। হাসলো সে।—আপনিই তো গত বছর ইজিপ্ট গিয়েছিলেন?

—আমাকে নেকস্ট ট্রেনেই যেতে হবে। কথা বলার আর শোনার সময় একটুও হবে না। অনিমেষ চেয়ারে বসলো।

—কিন্তু—। নীলা আর কৌশিকের দিকে তাকালো রমেন চক্রবর্তী।

—না—না—না, আপনার আজ যাওয়া হতে পারে না। কৌশিক কয়েক পা এগিয়ে গেলো অনিমেষের দিকে।

—আজ যেতেই হবে কৌশিকবাবু। আজ রাত্রে হাওড়া থেকে ট্রেনে মহারাষ্ট্রের বল্লারপুর যেতে হবে। আমার একজন ইনটিম্যাট ফ্রেণ্ড ভীষণভাবে ইনজ্যুরড হয়েছেন। যেতেই হবে। কথা দিচ্ছি—কয়েক মাসের মধ্যেই এখানে একবার আসবো। তখন মোর স্থান এ মাস্থ থাকবার চেষ্টা করবো। কী বলিস নীলা? মৃদু হাসলো অনিমেষ।

—এক জায়গায় দুই দিনের বেশী যে থাকতে পারে না, সে থাকবে মোর স্থান এ মাস্থ। ঠোঁট উল্টে অনিমেষের দিকে কটাক্ষ করে চলে গেলো নীলা।

—তাহলে এখনি একবার আপনাকে ব্যাটলফিল্ডে নিয়ে যাই। কী বলেন? রমেন চক্রবর্তী ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

—বেশী দূর তো নয়? আমাকে তিনটের ট্রেনটা ধরতে হবে।

—রিক্সায় দশ-বারো মিনিটের পথ।

—চলুন তবে। কৌশিকবাবু, আপনি রেডি তো?

—বহুদিন বাদে বৌদি এলেন। একটু সুখ-দুঃখের কথা হবে, তা নয়—। চলুন, আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় জলযোগ করে নেবো। অনিমেষকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো রমেন চক্রবর্তী।

আবার নীরবতা। অসহ্য নিচ্ছিদ্র নীরবতা।

কৌশিক আস্তে আস্তে তাকালো নীলার দিকে। নীলার কোলে ঘুমন্ত ছেলের দিকে।

নীলার আজ অন্য রূপ। কৌশিকের মনে হলো, কী এক সম্পদের ভারে নীলা আজ নম্র নত। সমৃদ্ধ গরবিনী নীলার দিকে তাকিয়ে কৌশিক নিজেকে অসহায় বোধ করছে। তার মনে হলো—সত্যের আর সৌন্দর্যের অনুভূতি নীলার মধ্যে এক হয়ে গেছে। অসম্পূর্ণ উপলব্ধির যন্ত্রণা ওর মধ্যে বুঝি একেবারেই নেই। নীলা আজ যেন তার প্রতিষ্ঠা আর প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সচেতন।

নিজেকে সহজ করে মুখর হতে চাইলো কৌশিক। অত্যন্ত লঘুপায়ে এগোলো নীলার দিকে।

খাটের উপর ছেলে কোলে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে নীলা।

খাটের পাশে গিয়ে নীলার চোখে চোখ রেখে দাঁড়ালো কৌশিক। যেন বহুদূর থেকে নীলাকে অন্য এক জগতের মধ্যে দেখছে। কিন্তু দীপ্তিময়ী নীলার দুচোখের গভীরে ও কী? কান্না কী থমকে আছে চোখের গভীরে! নীরব ঘরখানা চমকে উঠবে বলেই কৌশিক একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপলো। মুখ ঘুরিয়ে নিলো সে। ......নীলা কী তার নিশ্বাস সহ্য করতে পারছে না? তার উপস্থিতি কী নীলাকে আঘাত করছে? পিছন ফিরে পা বাড়ালো সে।

পিছন থেকে জামা টেনে ধরেছে নীলা। আশ্চর্য শান্ত স্বরে বলে উঠলো, বসো।

এ যেন নীলার আদেশ। খাটের উপর বসলো কৌশিক।

কৌশিকের হাতে হাত রাখলো নীলা। বললো, তুমি একেবারে শুকিয়ে গেছো। পিসিমা যাবার পর তুমি যে কীভাবে দিন কাটাতে

আমি তা ভেবেই পাচ্ছি নে। ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিলো নীলা। চুপিচুপি বললো, সরে এসো আমার কাছে—গায়ে গা লাগিয়ে বসো।

আবার যেন নীলা আদেশ করেছে।

কৌশিক নীলার মাথাটা টেনে নিলো বুকের মধ্যে।

নীলার চোখ ফেটে জল নেমেছে। তার এতদিনের ধৈর্য ভেঙে পড়েছে কান্না হয়ে।

নীলার উত্তপ্ত গালে গাল রেখে কৌশিক ভাবলো,—নারীর এই স্পর্শই যথার্থ স্পর্শ। এই স্পর্শই জীর্ণতাকে নবত্ব দেয়। এই স্পর্শেই কুঁড়ির ঘুম ভাঙে—ফোটার আবেগ চরিতার্থ হয়। ফুলের অত্যুজ্জ্বল বর্ণাঢ্যতা এখানে নেই, আছে ফুলের নম্রতা আর স্নিগ্ধতা। এই নম্রতা আর স্নিগ্ধতা চলার যন্ত্রণাকে মুছে নেয়, ক্লান্তি দূর করে নিশ্বাস প্রশ্বাসকে সহজ করে।

কৌশিক গাঢ়স্বরে বললো, জানতাম না আগে—প্রিয়ার ভালোবাসা প্রিয়কে দূরে ঠেলে দিয়ে আবার বুকে টেনে নেয়।

নীলা মনে মনে বললো, তোমাকে ভালবাসি—এইটুকুই তো আমার গৌরব।

কৌশিক বললো, তোমাকে কষ্ট দিয়েছি—এ দুঃখ আমার কোনো দিন যাবে না।

নীলা মনে মনে উচ্চারণ করলো, এ কষ্টটুকু আমার কাছে আশীর্বাদ। এ কষ্ট না পেলে তোমাকে হয়তো ছোটো করে ফেলতাম।

কৌশিক নীলার মুখখানা তার দিকে তুলে ধরলো। আবিষ্ট চোখে দেখলো—নীলার মুখখানা পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। ওর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

কৌশিক বললো, তোমাকে স্বচ্ছ চোখে দেখবার শক্তি দাও নীলা।

ব্যথায় যেন চীৎকার করে উঠলো নীলা, ও কথা বলো না তুমি।

আমি যে তোমার কাছে বড়ো—অনেক বড়ো হতে চাই। তোমাকে ছুঁতে চাই আমি। আমাকে ওকথা বলে ছোটো করে ফেলো না।

কৌশিক মনে মনে বললো, তোমাকে ছোটো করে ফেলি এমন শক্তি আমাতে নেই নীলা। তুমি তো জানো না, আমি কতো ছোটো, কতো দুর্বল। নীলার মুখখানা আবার বুকের মধ্যে চেপে ধরলো।

কিছুক্ষণ পরে কৌশিক বললো, পরশুদিন পিসিমার একটা চিঠি এসেছে। চিঠিটা আমাকে হতভম্ব করে দিয়েছে। ডাক্তার সেন বলে একজনকে বিয়ে করেছেন। বুড়ো বয়সে এই ব্যাপার! যৌবনের একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এমনিভাবেই কী করতে হয়! ব্যাপারটার গভীরে ঢুকতে এখনো ঠিক পারলাম না।

—আমি সব জানি। পিসিমা আমাকেও লিখেছেন। কৌশিকের বুক থেকে আস্তে আস্তে মাথা তুললো নীলা।—গুরুদেবের নির্দেশ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করলে, ভুলের মাশুল না দিলে মানুষের সব পাওয়া যে ব্যর্থ হয়ে যায়। নীলা হাসলো। গভীর শান্ত সহজ হাসি। ভোরের শুকতারার মতোই স্বচ্ছ হাসি।

তিন মাসের শিশু হাত-পা ছুঁড়ছে আর শব্দ করছে,—ওঁ-ওঁ-ওঁ।

নীলা বললো, মা নাম রেখেছেন টুকু, দাদা রেখেছেন টাটু, পিসিমার গুরুদেব রেখেছেন সম্বিত।

কৌশিক মৃদু হেসে সম্বিতের গালে কপালে তাব হাতের মৃদু স্পর্শ রাখলো।

খাট থেকে নেমে কৌশিক উত্তরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। অনেকদিন পর কৌশিক তাকালো তরুলতার দিকে। নতুন পাতায় পুরণো গাছের ডাল ছেয়ে গেছে। রিক্ত পত্র ছায়াশূন্য তরুর সারা দেহে আজ শ্যামল সমারোহ। দূরের ওই শিমূল গাছটি রাঙা ফুলের গর্বে ভরে উঠেছে। জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখেই সে বললো, একাজ ছেড়ে কোলকাতায় চাকরী নেবার পরিকল্পনা বাতিল করে দিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কৌশিক আবেগভরে বললো,

বসন্ত এসেছে—এতোদিন তা জানতে পারি নি। তুমি আজ অভিশপ্ত কচকে বর দিয়ে ত্রাণ করেছো।

জ্বলন্ত আকাশের স্পর্শে মাঠ-ঘাট গাছ-পালা সব পুড়ছে। মাটির বুক ফেটে চৌচির। নির্দয় আকাশের বুকে মাঝে মাঝে মেঘ আনাগোনা করে বটে, কিন্তু বৃষ্টির ছিঁটে-ফোঁটাও নেই। আষাঢ়ের মাঝামাঝি একটু বৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু তারপর থেকেই আকাশ নির্মম হয়ে উঠেছে। মাটির বুক থেকে মাথা তুলে পৃথিবীর আলো-বাতাসকে উপভোগ করতে চেয়েছিলো মাঠের ফসল। কিন্তু তাদের লীলাখেলা সাংগ হয়েছে।

বৃষ্টির দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে চব্বিশ প্রহর নাম-সংকীর্তণের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। চাষীরা সাড়ম্বরে ব্যাঙের বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির দেবতা মাঝে মাঝে পরিহাস করেন, কিন্তু সদয় হন না। মানুষের আশা আকাংখা প্রার্থণা আকাশের বুক ভেদ করে না।

গ্রামের কয়েকটা পুকুর শুকিয়ে বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে মানুষের হাহাকার। কান্নার আর প্রার্থণার শেষ নেই। দিনের পর দিন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে মানুষ হতাশ্বাস হয়ে পড়ছে। ভীতি আর সন্ত্রাসে ছেয়ে যাচ্ছে সারা দেশ।

ফার্মের পাম্প দিয়ে অন্যান্য চাষীদের জমিতেও জল সরবরাহের ব্যবস্থা কৌশিক করছে। অংশীদারদের কেউ কেউ এতে বেশ অসন্তুষ্ট। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য নগন্য। কৌশিক তা জানে। তবু যতটুকু বাঁচানো যায়।

মাঠের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কৌশিক। দিশেহারার মতো সে তাকালো চারদিকে। নিঃশব্দ কান্নায় ভরে গেছে তার বুক। আউশ ধান আর পাটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আরো জল দেওয়া

দরকার। প্রচুর জলের প্রয়োজন।…নির্জীব হয়ে বিশাল মাঠ পড়ে আছে। আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেওয়া ডানার মতো মাঠটার বুক থেকে সূর্যের শেষ আলো মিলিয়ে গেলো। সারা মাঠ বিরাট এক জন্তুর মতো মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

—চলুন ফেরা যাক।

রমেন চক্রবর্তীর কথায় হুঁশ ফিরে পেলো কৌশিক।

দুজনে নীরবে পাশাপাশি চললো। কিছুদূর চলার পর রমেন বলে উঠলো, কিষাণদের মজুরী বাড়াতে কেউ রাজি হবে বলে মনে হচ্ছে না। সঞ্জয়বাবু বলেছেন—মজুরী বাড়লে তিনি শেয়ার ছেড়ে দেবেন। হরেকৃষ্ণবাবু শুনে অবধি গোঁ গোঁ করছেন।

—কিন্তু কিছু না বাড়ালে ওদের অবস্থা যে শোচনীয়। আজকের বাজারে কিষাণদের ক্লেম অবশ্যই জাস্টিফায়েবল। চালের কে-জি তিন টাকা হতে আর দেরী নেই। তরী-তরকারীর বাজারে আগুন। পাঁচ টাকার কমে একটা লুঙি হয় না। খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই একটা বিরাট সমস্যা। মজুরী ওদের বাড়াতেই হবে। অন্তত—। কৌশিক হঠাৎ চুপ করে গেলো।

গম্ভীর হয়ে পথ চলতে লাগলো দুজনে।

চলতে চলতে থামলো কৌশিক। বলে উঠলো, একবার পরেশের কাছে যাওয়া দরকার। আপনি কী বলেন?

—চলুন।

চললো দুজনে। গ্রামের দক্ষিণে দাসপাড়ায় ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালো দুজনে। কে একজন শূন্যে লাঠি ঘুরোচ্ছে আর চীৎকার করে বলছে, হেই আমি মন্তর ঝাড়লাম। আত্তিরের মধ্যে বিষ্টি না হন তো শালা আকাশের গুষ্টি ব্যাচবো। শালা।

…একরাশ দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তি নিয়ে বাসায় ফিরলো কৌশিক। কিছু ভালো লাগছে না তার। দিনমজুরী কমপক্ষে পাঁচ টাকা না হলে কিষাণরা সংকল্প থেকে নড়বে না। পরেশ মণ্ডল কৌশিক আর রমেনের মুখের উপর বলেছে, আপনারা মাত্তর দু-তিনজন। আপনারাই

বলুন ঐ টাকায় সংসার চালাতে পারেন? আমাদের ঘরে একগাদা লোক। কেমন করে হয় আপনারাই বলুন। রূঢ় কণ্ঠে পরেশ মণ্ডল আরো বলেছে, না খেয়ে মরি সেও ভালো, কিন্তু আপনাদের হাতে মার খেয়ে মরবো না। কৌশিক চুপ করে থেকেছে। রমেন মাথা নীচু করেছে। কঠিন হতে চেয়েছে, রমেন, কিন্তু পারে নি। কৌশিক ফার্মের ম্যানেজার এবং কিছু জমির মালিক হলেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন। সে শুধু পরেশ মণ্ডলকে বলেছে, সামনের মিটিং-এ আমরা চেষ্টা করবো। রমেন চক্রবর্তী বলেছে, তোরা এ ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ করিস নে কিন্তু। যদি কিছু করতেই হয় নীরবে করবি।

কৌশিক বাসায় এসে দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়লো। মেজের উপরেই বসে পড়লো সে। কিছুই ভালো লাগছে না তার।

রমেন চক্রবর্তী হৈ-চৈ করতে লাগলো।—বৌদি, আই এ্যাম ভেরী হাংগরি। কী আছে বের করুন।

নীলা হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালো।—একটু ওয়েট করুন, বাজার থেকে কিছু আনিয়ে নিই।

অধৈর্য হয়ে উঠলো রমেন চক্রবর্তী। চেঁচিয়ে উঠলো, মুড়ি চিড়ে যা আছে তাই দিন। পেট চোঁ চোঁ করছে। তেল লংকা দিয়ে মুড়ি-টুড়ি দিন।

কৌশিকের দিকে তাকালো নীলা—তোমার আবার কী হলো?

রমেন চক্রবর্তী উত্তর দিলো, দাদাকে বিরক্ত করবেন না বৌদি। উনি সিরিয়াসলি উনডেড। আপনি প্লিজ আমার জন্যে একটু ব্যবস্থা করেম।

কৌশিক চোখ বুঁজে ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। বুঝি সমস্যার নাগাল পেরিয়ে অন্য কোথাও ছুটে যেতে পারলে সে এক নিশ্চিন্ত হতে পারত। মানুষের জীবনে কী সমস্যার শেষ নেই? এমনি ভাবে সমস্যার দোলায় দুলতে দুলতে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে সে?

—মাঠি ফুটি-ফাটা হয়ে খাঁ খাঁ করছে। বর্ষাকাল শেষ হতে চললো।

মাটি আর মাটির মানুষের সংগে জড়িয়ে পড়ার এত যন্ত্রণা! জল নেই—মাঠ ফুটি-ফাটা হয়ে খাঁ খাঁ করছে। বর্ষাকাল শেষ হতে চললো ফার্মের কথা ভেবে নয়, সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই যেন শিউরে ওঠে সে। এর উপর আবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্য। আর একটি নতুন সমস্যা জুটেছে। —কিষাণরা তাদের ন্যায্য দাবি পেশ করেছে—মজুরী বাড়াতে হবে। প্রতিটি সমস্যাই তীব্র কঠিন পীড়াদায়ক।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে বক বক করছে রমেন। নিজের কথা, স্কুলের কথা, যাত্রাদলের কথা নীলাকে শুনিয়ে চলেছে সে।

হঠাৎ নীলা প্রশ্ন করে বসলো, বিয়ে না করলে দেখছি আপনার দড়ি-ছেঁড়া গরুর ভাবটি যাবেনা।

গম্ভীর হয় রমেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললো, আমার আটত্রিশ বছর জীবনে এমন কোনো মেয়ে দেখলাম না যাকে সর্বস্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

নীলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, একজনকেও চোখে পড়লো না?

—চোখে পড়ার কথা নয় বৌদি। ইনটারেষ্টেড হয়ে কেউ যদি এগিয়ে আসে আমার কাছে, তবে নিশ্চয়ই আমি ধরা দেবো তার কাছে।

—ঝর্ণাকে আপনার কেমন লাগে?

—ভীষণ ফ্যাশানেবল্ আর ফ্যানফ্যারন্!

—ঝর্ণা প্রতি চিঠিতেই কিন্তু আপনার কথা লেখে। নীলা হাসলো। মৃদু হ্যারিকেনের আলোয় নীলা দেখলো—রমেন ভ্রূকুঞ্চন করলো।

আগের চেয়েও গম্ভীর হয়ে রমেন ধীরে ধীরে বললো, আমাকে প্রায়ই চিঠি দিতেন ঝর্ণা দেবী। আমিও দু-একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। প্রায় মাস দশেক হলো আর চিঠি দিই না। তাঁর শেষ কয়েকটি চিঠির ভাষা আনসিভিল এ্যাণ্ড আনসাউণ্ড! শী আনমেকস্ মাই ফিলিংস্।

নীলা কৌশিকের দিকে তাকালো।

কৌশিক গম্ভীর স্তব্ধ হয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। একটা চিন্তা তার বুকের মধ্যে কেবলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।—যে সমস্যার সমাধানের নাগাল সে পায় না, তার মধ্যে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতর হওয়ার কারণ কী? হঠাৎ কৌশিকের মনে হলো, কোনো পাওয়াকে মানুষ যখন সম্পূর্ণ বলে মনে করে, তখনি তো আসে যন্ত্রণা। আবার না পাওয়াও যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই তো সংগ্রামী মানুষের নিত্য পথচলা। মাটি আর মানুষকে সম্পূর্ণ করে পেয়েছে বলেই তার ধারণা হয়েছিলো। স্থির হতে চলেছিলো সে। সমস্যা তাই যন্ত্রণার বেগে এসে আঘাত দিয়ে তাকে চঞ্চল করতে চাইছে। শুধু তার নিজের জীবনে নয়, বিশ্বকেও গতিময় করে তুলবার জন্যে সারা বিশ্ব জুড়ে সমস্যা। কাশ্মীর, কচ্ছ, চীন-ভারত সীমান্ত, বাংলাদেশ, পাকিস্থান নিয়ে সমস্যার শেষ নেই। নতুন সৃষ্টির স্পন্দনে মুখর হবার জন্যেই সারা পৃথিবী বুঝি যন্ত্রণা বরণ করে নিচ্ছে।

রান্নাঘরের দিকে চেয়ে নীলা বললো, মানুদি, চা নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ পরেই মানুদি অর্থাৎ পাচিকা মানদা চা নিয়ে ঢুকলো।

রমেন বললো, বি, এস-সি পরীক্ষার পর আমার বিয়ে প্রায় হতে হতে হয় নি। এতক্ষণ পর হেসে উঠলো রমেন।

নীলাও হাসিতে যোগ দিলো।—কী ব্যাপার? ভেরী ইনটারেষ্টিং মনে হচ্ছে।

হাসতে হাসতে রমেন বললো, পরীক্ষা দিয়ে এসেই শুনি আমার পিতৃদেব বিয়ের ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। দিনক্ষণও স্থির। গুডবয়ের মতো বরের সাজগোছ করে সাড়ম্বরে বিয়ে করতে এলাম মুড়াগাছায়। তারপর বিয়ের পিঁড়িতে বসবার ঠিক আগের মুহূর্তে একেবারে হাওয়া হয়ে গেলাম। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো রমেন।

—কীভাবে আর কেনই বা পালিয়ে গেলেন?

— আজ না, আর একদিন বলবো। এক চুমুকে চা শেষ করে

উঠে দাঁড়ালো রমেন।

—আর একটু বসবেন না? কথাটা যে শোনা হলো না।

—বসতে খুবই ইচ্ছে করে বৌদি। বিশেষ করে আপনার কাছে। কিন্তু সাহস পাই নে। যদি কোনো দিন আপনার অমর্যাদা করি!

মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেলো নীলা।

রমেন দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললো, প্রথম প্রথম আপনার কাছে এলে নিজের মধ্যে কেমন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করতাম। আপনাকে খুব ভালো লাগতো। মনে হতো আপনার মতো মেয়েকে বিয়ে করে ভালোবেসেই সুখ। আপনার মতো মেয়েকেই বিয়ে করে সুখ। নানা ধরণের বিকৃত চিন্তা করতাম। রমেনের কণ্ঠস্বর সহজ জড়তা-শূন্য। —বিকেল হলেই আপনার কাছে আসবার জন্যে মনটা পাগলামি শুরু করতো।

যেন রুদ্ধশ্বাসে কথা শুনছে নীলা।

রমেন জড়তাশূন্য কণ্ঠে বলছে, একদিন নিজেকে শাসন করলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম—দরকারে দাদার কাছে যাবো। নইলে যাবো না। প্রায় বছর খানেক আপনার সামনে মোজ করে বসে গল্প করি নি। যেদিন আপনার কোলে দেখলাম একটি দেব শিশুকে, সে দিন কেন যেন আপনাকে মনে হলো—আপনি শ্রেয়তপা, ইউ আর বিলংগিং টু দি সুপ্রিম বিয়িং। সেদিন থেকেই আপনার সামনে বসে গল্প করার সাহস রিগেন করেছি। বৌদি, চোলি। দাদা, চললাম।

রমেন চক্রবর্তী বেরিয়ে গেলো।

ঠোঁট চেপে স্তব্ধ হয়ে দরজার বাইরে জ্যোৎস্নাধারা প্রকৃতির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নীলা।

কৌশিক নিজের চেতনার মধ্যে আচ্ছন্ন মগ্ন হয়েই আছে। —সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে,—কঠিন সংগ্রামের দিন আসছে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের দল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সর্বনাশের মধ্যে দিয়ে বুঝি নির্ধারিত হবে মানবভাগ্য। অকম্পচিত্তে কৌশিক ভাবতে চেষ্টা করলো—তার জীবনেও কোনো সর্বনাশ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে।

নিস্পৃহ হয়ে কৌশিক ভাবলো—তার জীবনের সমস্ত চেষ্টা ভ্রান্তি পাওয়া না-পাওয়া সুখ-দুখ তাকে কোন সংগ্রামের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে! স্থির হয়ে বসে রোমাঞ্চকর গতিরাগের কল্পনার মধ্যে, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চলার মধ্যে যে যন্ত্রণা এতকাল ধরে সে পেয়েছে, আজকের যন্ত্রণার মধ্যে তার কোনো ছায়া নেই। কৌশিক স্পষ্ট বুঝতে পারছে --আজ তার জীবনে নতুন যন্ত্রণা। এর স্বাদ আলাদা।

অনেকক্ষণ পর নীলা চেপে রাখা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কৌশিকের দিকে তাকালো। এগিয়ে গেলো তার দিকে। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো তোমার? শরীর ভালো তো?

কোথায় ডুবে যাওয়া চোখ আস্তে আস্তে মেললো কৌশিক। ভাবাবিষ্ট কণ্ঠে বললো, আচ্ছা নীলা, ভালোবাসা মানুষকে ভীষণ কষ্ট দেয় কেন—বলতে পারো?

—হঠাৎ আবার এ কথা কেন? দুরু দুরু বুকে নীলা কৌশিকের পাশে বসে পড়লো।

—ভালোবেসে তুমি কি কষ্ট কোনোদিন পাও নি?

—সেই কষ্টটুকুই তো আমার সম্পদ, আমার কাছে আশীর্বাদ।

—ভালোবাসা মানুষকে কী শুধু কষ্টই দেয়? তাকে কী দূরে ঠেলে দেয় না।

—অমন কথা বলো না, আমার কেমন ভয় করে। তুমি তো কিছুই খেলে না। চা তো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

—ভালোবাসা সজোরে মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়—হয়তো পুরোণোকে নতুন করে পাবার জন্যেই। তুমিও আমাকে একদিন দূরে ঠেলে ফেলে আবার তোমার কাছে নিবিড় করে টেনে নিয়েছো। আবার তেমন খেলা ভালোবাসা যদি খেলে—।

নীলার দৃষ্টি বড় করুণ হয়ে উঠলো। কৌশিকের একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো, হঠাৎ বাজে বকছ কেন? দিন দিন কেমন যেন ইমাজিনেটিভ হয়ে পড়ছো তুমি। সেই তখন থেকে ঝিম ধরে বসে আছো। গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছো। কই, ওঠো তো!

কৌশিক তেমনি ভংগীতেই বসে রইলো। তেমনি আবেগভরা কণ্ঠেই বললো, বাবা চেয়েছিলেন মাটি আর মাটির মানুষকে আমি যেন গভীরভাবে ভালোবাসি। পিসিমা চান সাংসারিক জীবনে আমি যেন কৃতকার্য হই। মায়েরও হয়তো গোপন ইচ্ছে ছিলো সংসারের অফুরন সৌন্দর্যরাশির মধ্যে আমি বড়ো হয়ে উঠি।

কৌশিকের বুকে হাত রেখে নীলা গাঢ় স্বরে বললো, তাঁরা বিভিন্ন ভাবে একটা কথাই তো বলেছেন।

—তুমি কী চাও—তা তো কোনোদিন বলো নি। কৌশিক নীলার মুখের উপর তার ভাবাবিষ্ট চোখ দুটো রাখলো।

—তুমি যাই হও, আমায় নির্দিষ্ট স্থানটুকু দিও। বলে কৌশিকের পায়ে হাত রাখলো নীলা।

—তুমি তো আমার জীবনে সুরের নীড়। তুমি আমাকে নতুন করে মাটির রাজ্যে ফিরিয়ে এনেছো। মাটিকে ভালোবাসতে গিয়েও ভীষণ যন্ত্রণা। কৌশিক তার পায়ের উপর থেকে নীলার হাতখানা টেনে নিলো। চুপিচুপি স্বরে বললো, যন্ত্রণার উপসম সংগ্রামের মধ্যে। বাবার ছিলো ইন্‌বরন্‌ সংগ্রাম-শক্তি। আমার তো সব ধারকরা। শুধু ভয় হয়—।

কৌশিকের মুখে হাত চাপা দিলো নীলা। আবেগ স্পন্দিত হয়ে বললো, মা-বাবার আশীর্বাদ, পিসিমার স্নেহ, মানুষের শুভেচ্ছা তো তোমার উপর আছেই। আমাকে আর টুকুকেও সংগে নিও। সেই কবিতাটি মনে পড়ে না—'দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে, মরু-পথ-তাপ দুজনে নিয়েছি সহে।'

পাশের ঘর থেকে সম্বিতের কান্নার শব্দ ভেসে এলো।

কৌশিক বললো, টুকু কাঁদছে। নিয়ে এসো ওকে।

নীলা সম্বিতকে এনে কৌশিকের কোলে দিলো। হাত-পা নেড়ে হাসছে সম্বিত। আধো আধো স্বরে বললো, বাব-বা, বাব-বা!

কৌশিকের বুকের মধ্যে নতুন ধরণের একটা যন্ত্রণা শিরশির করে উঠলো। সম্বিতকে বুকে চেপে ধরলো সে।

ভোরবেলা দরজা খুলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কৌশিক।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হলো। একটু একটু যেন মেঘ জমছে আকাশে। কৌশিকের মনটা খুশী হয়ে উঠলো।

খালি পায়ে খালি গায়ে কৌশিক হাঁটতে শুরু করলো। চারিদিকে চেয়ে তার মনে হলো—রুক্ষ প্রকৃতি তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে বুঝি চেয়ে আছে আকাশের মেঘের দিকে। ঐ মেঘের সবটুকু রস পান করে উদ্দাম হয়ে প্রকৃতি হাসতে চায়।

কৌশিক মেটে রাস্তা ধরে আপন খেয়ালে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো।

সকালের সূর্যকে আজ আর দেখা যাবে না। নীল আকাশকে একেবারে ঢেকে ফেলবার জন্যে মেঘ কোথা থেকে যেন ছুটে আসছে।

কৌশিক আকাশের দিকে তাকিয়ে বুকভরে নিশ্বাস নিলো। সকালটাকে মনে হচ্ছে সন্ধ্যাকাল। কৌশিক গাছ-পালার দিকে তাকিয়ে আবার নিশ্বাস নিলো। আবার—আবার।

একটা রিক্‌সা আসছে। কৌশিক রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ালো। রিক্‌সাটা তার পাশে এসে থেমে পড়লো।

কৌশিকবাবু না!

কৌশিক চমকে উঠলো একটি নারীর কণ্ঠস্বরে। থতমত খেয়ে তাকালো। রিক্‌সা থেকে নেমে এলো রেখা দেবী। হেসে বললো, আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

অবাক বিস্ময়ে কৌশিক তাকালো রেখা দেবীর দিকে। চেহারায় আর পোষাকে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন আসায় রেখা দেবীকে চিনতে কষ্ট হবে অনেকেরই। বাড়িতে বহু রকম পরিবর্তন দেখেছে সে। সে পরিবর্তন আর আজকের পরিবর্তনের মাঝে বিপুল ব্যবধান। এতটুকু সাজগোছ নেই। নিতান্ত আটপৌরে ঘরোয়া সাজ। চোখে মুখে প্রসাধনের লেশ নেই। রেখা দেবী বাইরে যখন বের হত তখন তার প্রতিষ্ঠা আর প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকত। পোষাকে

চাল-চলনে একটা উগ্র আভিজাত্যের পরিচয় দিতে চেষ্টা করত। বাইরে রেখা দেবী সর্বদা সন্ত্রস্ত, সর্বদা সাবধান। আজ ওর দেহের কোথাও এতটুকু ঔদ্ধত্য নেই, এতটুকু বাহুল্য নেই।

রেখা দেবী পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো কৌশিকের দিকে। সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো। একরাশ বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে অবাধে রেখা দেবীর দিকে তাকালো কৌশিক। রেখা দেবীও তাকালো। ওর দৃষ্টির মধ্যে লজ্জা নেই। চোখ মুখ ওর শুকিয়ে গেছে। চোখে মুখে চুলে কেমন একটা রুক্ষতা। কিন্তু সব কিছুর উপরে ছাপিয়ে উঠেছে একটা প্রসন্নতা।

কৌশিক একটু হেসে বললো, আপনাকে চেনাই যাচ্ছে না।

—আপনাকেও। ঠোঁট টিপে হাসলো রেখা দেবী।

কৌশিক নিজের দিকে তাকালো। তার খালি গা, খালি পা। কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তোলা। সে বললো, অনেকদিন পর আকাশে মেঘ দেখে মনটা নেচে উঠলো। তাই একটু ঘুরছি। বলুন, এত ভোরে কী ব্যাপার?

শান্তকণ্ঠে রেখা দেবী বললো, চলে যাচ্ছি। তাই দেখা করতে এলুম।

কৌশিক সহসা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। একবার মাটির দিকে, আর একবার আকাশের দিকে তাকালো। কোনো কথা খুঁজে পেলো না।

রেখা দেবী বললো, যাবার আগে আপনার সংগে দেখা না করে গেলে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যেতুম। ভেবেছিলুম, আপনি আমার কাছে একদিন যাবেন। আপনি নিজের হাতে পানিসমেণ্ট দেবেন। আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনার মতো পুরুষের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক ছিলো।

মনে মনে একটু সংকুচিত হলো কৌশিক। প্রায় এক বছর আগে বর্ষার এক রাত্রে রেখা দেবীর বাড়ী থেকে আহত হৃদয় নিয়ে ফিরে এসেছিলো সে। তারপর সেই বাড়িতে যাবার এতোটুকু স্পৃহাও

তার মনে জাগে নি সেদিনের পর মাত্র দুদিন রেখা। দেবীর সংগে রাস্তায় দেখা হয়েছিলো। একদিন দুহাত তুলে নমস্কার করেছিলো সে। আর একদিন রেখা দেবী জিজ্ঞেস করেছিলো, কেমন আছেন? শুনলাম আপনার ছেলের নাকি হামজ্বর। এখন কেমন? সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে চলে গিয়েছিলো কৌশিক, ও-কে।

একটু হেসে কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ চলে যাচ্ছেন কি মনে করে? মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তাকালো সে।

রেখা দেবী হাসলো। বললো, লোভে পড়ে কোথাও যাচ্চি নে। এতোদিন ফুটে ওঠার নামে, সত্যের নামে ইনস্‌টিংকট্‌কেই খুঁচিয়েছি। রেখা দেবীর চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে কোথাও দ্বিধাসংকোচের ছায়ামাত্র নেই।—আমার বত্রিশ বছরের জীবনে বহু পুরুষকেই পেতে চেয়েছি। সবাই এসেছে। নিজে ফুটতে গিয়ে নতুন সংসার রচনা করতে গিয়ে সবাইকে বিফল করেছি। ফুলের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সবাই ফিরে গেছে। কিন্তু—রেখা দেবী হাসলো। শান্ত মালিন্যমুক্ত হাসি।—আপনাকে পেতে গিয়ে আমি নিজে বিফল হয়েছি, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছি। পুরু লেন্সের আড়ালে রেখা দেবীর চোখদুটো স্থির হয়ে আছে।

কৌশিক এক মুহূর্তে দ্বিধা করে বললো, এসব না বললেই ভালো করতেন। মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো সে।

—যাঁকে শ্রদ্ধা করতে আজ শিখেছি, তাঁকে এ কথা না বললে আমার নারীত্বের মুক্তি হবে না যে।

—কিন্তু বিশ্বাস করুন রেখা দেবী, আপনার সংগে আমার বিহেভিয়ার যে ধরনেরই হোক না কেন, আমার মন আপনার মধ্যে আনন্যাচারাল বা আগ্‌লি কিছু দেখে নি। আপনার চলার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু আকাংক্ষা আনসিভিল ছিলো না। যেটাকে আমরা ডাউনফল মনে করি, সেটা হয়তো ইনডেকস্‌ অব আন্‌ফোল্ডমেণ্ট।

—কিন্তু—

—আপনার সব কথা শোনার পরেও আমার ধারনা তাই বলে পাল্টাবে না। যাক,—কোথায় যাচ্ছেন, কবে যাচ্ছেন তা তো কিছু বললেন না।

—মীরে-পলাশীকে আর ভালো লাগছে না বাংলার বাইরে কোথাও যাবো। আসামের কোথায় যেন মামা এক স্কুল খুলেছেন। সেখানেও যেতে পারি। তিনি বার বার বলেছেন।

—আপনার বাড়ি, ফুলবাগান? কৌশিক একটু উৎকণ্ঠিত হলো।

—মা আর বিনু এখানেই থাকবে। মাঝে মাঝে ওদের একটু আধটু দেখাশোনা করবেন। বিনুর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন রমেনবাবু। ফুলের বাগানের কথা বলছেন? নাউ আই এ্যাম ইন দি রেজম্ অব আন্‌ফোল্ডমেণ্ট। রেখা দেবীর মুখে বুঝি এক ঝলক আলো ছড়িয়ে পড়লো।

—জায়গাটাকে ভালো না লাগার কারণ? কৌশিক কৌতুহলী হলো।

—জানেন বোধ হয়—এক ধরনের পাখি আছে যারা ডিম পাড়বার জন্যে পুরোনো আস্তানা ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে কোথাও চলে যায়।

রেখা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে কৌশিক সহসা কেন যেন কথা বলতে পারলো না।

রেখা দেবীই আবার বললো, কারুর নতুন রূপ দেখলে মানুষ তার পিছনে কোনো মতলব আছে বলে মনে করে। মানুষের বিষনজর ফুটন্ত ফুলের পক্ষে সহ্য করা মুস্কিল।

—দিদি, আমি কী থাকবো? রিক্সাওয়ালা চেঁচিয়ে উঠলো।

—একটু দাঁড়া রাজু। এখনি যাবো।

কৌশিক যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো, এখন যাবেন মানে! আমার বাসা হয়ে ঘুরে যান। এখান থেকে ফিরে গেলে নীলা খুব ব্যথা পাবে।

রেখা দেবী হেসে বললো, নীলাকে কাল সব বলেছি।

কী ভেবে কৌশিকের বুকের ভিতরটা ব্যথায় ভরে উঠলো। খুব আস্তে আস্তে বললো, আপনি চলে যাচ্ছেন, নিজেকে কেন যেন ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। যে আকাশে সূর্য ওঠে, সেই আকাশই আবার মেঘে ঢেকে যায়।

—আবার সেই আকাশই শান্তি-বারি বর্ষণ করে। যাক ও সব কথা। আপনি হয়তো বয়সে ছোটো। প্রণাম আপনাকে করা চলে না। দেখি আপনার হাতখানা।

কৌশিক তার ডান হাতখানা প্রসারিত করলো। দু হাতের মুঠোর মধ্যে কৌশিকের হাতখানা চেপে ধরলো রেখা দেবী।

কৌশিক লক্ষ্য করলো—পুরু লেন্সের আড়ালে দুটি চোখ সহসা বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। কৌশিক প্রশ্ন করলো, আপনার হাজব্যাণ্ডের কথা জানতে ইচ্ছা করে খুব। আপনাদের সম্পর্কের মধ্যের মিস্ট্রিটা কী?

—এতোদিন পরে সে কথা না-ই বা শুনলেন! তবে আজ ছ'মাস হলো তিনি মারা গিয়েছেন। সহজ নির্বিকার কণ্ঠে কথা বললো রেখা দেবী। কৌশিকের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখলো। কেন যেন তার চোখদুটো ভিজে আসছে। রুদ্ধকণ্ঠে বললো, তবে চলি কৌশিকবাবু। কৌশিকের হাতের তালুতে তার মুখখানা মুহূর্তের জন্য রাখলো। তারপর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে রিক্সায় গিয়ে উঠলো।

রিক্সা চলতে শুরু করেছে।

কৌশিক দ্রুত এগিয়ে গেলো রিক্সার পাশে। অনুচ্চস্বরে আন্তরিকতার সংগে বললো, হোপ ইউ উইল মেক আপ টু ইয়োর ফুল-ব্লোম ফিউচার।

একটু হাসলো রেখা দেবী। স্পন্দিত কণ্ঠে বললো, আপনার কাছ থেকে সংগ্রামের প্রেরণা নিয়েই যাত্রা শুরু করছি। আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট।

কৌশিকের মনে হলো রেখা দেবীর দুচোখ বেয়ে জল নেমেছে।

রিক্সা মেটে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে।

কৌশিক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দেখলো, লাল পাড় শাড়ির আঁচল রিক্সার পিছনে উড়ছে। তার মনে হলো, বহুদিনের ছদ্মবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে ছুটে চলেছে এক নারী। বেরিয়ে পড়েছে সংগ্রামের প্রেরণায়।

ম্লান বিকেলের আলোয় কংক্রিটের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কৌশিক তার দৃষ্টিটাকে ছুঁড়ে দিলো—সমস্ত মাঠ জলময়। মাঝে মাঝে দু-একটা বড়ো বড়ো গাছ তাদের গৌরবময় অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

দশদিন ধরে বৃষ্টির পর কয়েকদিনের জন্যে আকাশটা মেঘমুক্ত হয়েছিলো। আবার বৃষ্টি নেমেছিলো। দু সপ্তাহ ধরে অবিরাম বর্ষণের পর আকাশ ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত হয়েছে।

কৌশিক কান পাতলো। দূরে জলের তীব্র গর্জন শোনা যাচ্ছে। কালীগঞ্জ যাবার রাস্তার পুল দিয়ে জল ঢুকছে ভয়ংকর দৈত্যের মতো দশদিক প্রকম্পিত করে।

আজ সকালে কৌশিক চিনিকলের কাছে গংগার বাঁধের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মিলের ইঞ্জিনিয়ার আর কোন সুপারিনটেনডেণ্টের সংগে নীচু হয়ে, কখনো প্রায় মাটিতে শুয়ে পরখ করেছে ফাটলের ক্ষীণতম রেখা পড়েছে কিনা কোনোখানে। দেখতে দেখতে অনেক দূর চলে গিয়েছিলো। শুনেছিলো, রামপাড়া বলে জায়গাটাকে কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। সেখানে বাঁধ ভেঙে তীরগতিতে জল ঢুকছে। উচ্ছৃংখল সুচতুর জল রামপাড়াকে বুঝি নিশ্চিহ্ন করতে চলেছে। বাঁধের উপর মানুষের পাগলের মতো ছোটাছুটি দেখছে কৌশিক। দিশেহারা হয়ে পড়েছে মানুষ। নদীতীরবর্তী গ্রামের অভিজ্ঞ প্রধান মানুষরা মন্তব্য করেছে—এবার নদীর রুদ্র মূর্তিকে ঠেকানো দুষ্কর। এমনিই চারদিক জলে একাকার

—টইটম্বুর। গংগা ক্ষেপে গেলে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এবার বোধ হয় নিস্তার পাওয়া মুসকিল। এক মুঠো মাটি নিয়ে যারা মাটির গুণাগুণ বলে দেয়, নদীর বাইরের রূপ দেখে যারা নদীর মতলব ধরে ফেলে, -তেমনি ধরনের মানুষই বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ভীত বিহ্বল হয়ে থেকেছে। বহু মানুষের দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দকে কৌশিক হৃদয়দীর্ণ কান্না বলেই মনে করেছে। অনাবৃষ্টির জন্যে চারদিকে যে হাহাকার জেগেছিলো তার মধ্যে দুঃখের ভার ছিলো প্রচুর। কিন্তু আজকে অতিবৃষ্টির ফলে যে সঘন দীর্ঘনিশ্বাস তার মধ্যে দুঃখ থাকলেও নৈরাশ্যই বেশী।

কিছুক্ষণ আগে কৌশিক সংবাদ পেয়েছে চিনিকলের কাছে গংগার বাঁধ ভেঙে গেছে। ক্ষ্যাপা জল ছুটে আসছে মানুষের দীর্ঘনিশ্বাসকে স্তব্ধ করে। ছুটে আসছে একটা ক্ষুধার্ত বিকটদর্শন দৈত্য। শতসহস্র মুখে তীব্র গর্জন তুলে নদীজল ঢুকছে।

শংকিত পায়ে সে চললো।

রায়পাড়ার পশ্চিমে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। এক-শোর বেশী কোদাল কাজ করে চলেছে। বেশ চওড়া করে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। রায়পাড়া দিয়েই ক্ষ্যাপা জল গ্রামে ঢুকতে চাইছে। মাটির সংগে খড় আগাছা দেওয়া হচ্ছে। বাঁধের গায়ে গায়ে পোঁতা হচ্ছে বাঁশের খোঁটা। প্রাণপণ চেষ্টা চলছে জল আটকাবার। নীরবে কাজ করে চলেছে মানুষ। বাঁচতে হবে উন্মত্ত উচ্ছৃংখল জলরাশির সঙ্গে সংগ্রাম করে।

অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভাপতি অরুণবাবু সিগারেট টানতে টানতে এগিয়ে এলেন। তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, কী রকম বাঁধ দেওয়া হচ্ছে—দেখলেন তো! জলের সাধ্য কী বাঁধকে অগ্রাহ্য করে আসে।

আস্তে আস্তে বাঁধ উঁচু হয়ে উঠছে। সবার চোখে মুখে দুরন্ত আশা, বুকে বাঁচবার উদগ্র আগ্রহ। ঝপাঝপ মাটি ফেলা হচ্ছে। কয়েকটি ছোটো ছোটো ছেলে দুহাতে মাটি নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে বাঁধের উপর। কাজের আনন্দ যেন পেয়ে বসেছে ছেলেদের। বড়োদের সাহায্য করতে পেরে ওরা বুঝি গৌরব বোধ করছে।

—বাড়ি-ঘর না হয় বাঁচলো। কিন্তু মানুষ বাঁচবে কেমন করে? এক ছটাক ফসলও তো ঘরে উঠবে না।

অরুণবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুধু ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন।

ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে কৌশিক তেমন ভরসা পায় না। বাঁধ যত শক্ত ও উঁচু হয়ে উঠছে, জলও তত ফুলছে। উন্মত্ত গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাঁধের উপর। লোলুপ ভংগীতে কেমন অবিশ্রান্ত ছটফট করছে বন্যার জলরাশি। বন্যার উদাত্ত গর্জনে যেন প্রলয়-সংকেত, ক্ষুধার্ত কামনার দৃপ্ত অভিব্যক্তি। বিস্তারের নির্লজ মোহ প্রতি জল বিন্দুতে।

ছলাৎ করে জল এসে পড়লো কৌশিকের পায়ে। যেন বিদ্রূপ করে উঠলো। এতগুলো মানুষের চেষ্টাকে যেন তাচ্ছিল্য করছে।

উচ্ছৃংখল জলরাশি বাঁধের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে ছল্‌কে এদিকে এসে পড়ছে।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর কৌশিক এগিয়ে গেলো। একজনের হাত থেকে কোদাল ছিনিয়ে নিয়ে মাটি কাটতে শুরু করলো। অনভ্যস্ত হাত দুটো উচ্ছল হয়ে উঠলো। পায়েব এক জায়গায় খানিকটা কেটে রক্ত পরতে লাগলো। কিন্তু কোনো দিকে খেয়াল নেই কৌশিকের। উদ্দীপ্ত উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সে। অনবরত কেটে চললো মাটি। দরদর ধারে ঘাম ঝরতে লাগলো।

কোথা থেকে পরেশ মণ্ডল এসে তার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়েই কোদালটা বললো, এ সব কী আপনার শোভা পায়! পা দিয়ে রক্ত পড়ছে আপনার। কই—আপনি সরুন তো! বুকে চাপড় দিয়ে শক্ত হাতে কোদাল ধরলো সে। —এই হেঁইয়ো!

এক জায়গায় এসে বসলো কৌশিক। হাঁফাচ্ছে সে।

কখন যেন রমেন চক্রবর্তী এসেছিলো। বসে পড়লো কৌশিকের পাশে। বললো, খুব তো এক হাত কাজ দেখালেন। কিন্তু বাঁধ টিকবে তো। একেবারে নো হোপ, নো চান্স।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো কৌশিক। দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর

করণীয়ই বা কী! অজানা আশংকায় ভরে উঠেছে তার মন। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সহজ সরল জীবনযাত্রা ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে সবার শান্তি, সবার চেতনা।

—বিকেলবেলা কুলবেড়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের কাশেম খবর দিলো—ওদিককার গ্রামগুলো প্রায় জলের তলায়। রমেন চক্রবর্তী দুঃখসূচক একটা শব্দ করলো।

ভরা পূর্ণিমা। জোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। তবু কয়েকজন তিনটে হ্যাজাক জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দিলো গাছে।

অরুণবাবু একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে সিগারেট টানছেন। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে ক্রুদ্ধ চেতনার হাত থেকে রেহাই পেতে চান। ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কৌশিক আর রমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন আপনারা এদের কাছে একটু থাকবেন। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে ট্রাংক-কল করতে চললাম আমি। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, এদিকের কাজ হয়ে গেলে দাসপাড়ায় একবার যাবেন। ওখানেও বাঁধ দেওয়া হচ্ছে।

অরুণবাবু চলে গেলেন।

—দাদা, অনেকক্ষণ পরে রমেন কথা বললো, আমি আজ রাত্রির ট্রেনে চলে যাচ্ছি। রমেনের কণ্ঠ শান্ত গম্ভীর।

কৌশিক নিস্পৃহকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কোথায়?

—আসাম যাবো।

—হঠাৎ?

—রেখার চিঠি পেয়েছি আজ। সে ব্যাকুল হয়ে ডাক দিয়েছে আমাকে। আপনি হয়তো অবাক হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। রমেনের কণ্ঠে দ্বিধা সংশয় নেই।

কৌশিক ভ্রূভংগী করলো। তারপর তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে রইলো।

রমেন বললো, রেখা এখান থেকে যাবার কদিন আগে কেন যেন সব কথা আমাকে বললো। তার সব মিথ্যা, সব গ্লানির কথা, তার ছলনা-প্রবঞ্চনার কথা। সেই রঙ্গময়ী অভাগিনীর জন্যে সেদিন ফীল্ করেছিলাম। আপনি তাকে আঘাত দিয়েছিলেন, সে কথাও শুনেছি। সারা জীবন ধরে ফাঁকির কারবার করে এলেও আজ তার আমাকে আহ্বানের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই।

কৌশিক রমেনের মুখের দিকে তাকালো। রমেনেব দৃষ্টি কোথায় যেন ভেসে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে রমেন আবার বললো, রেখার সংগে পরিচয় বেশী দিনের নয়। মাত্র তিন-চার মাসের। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—সে আমার বহুদিনের পরিচিতা। যাবার আগের দিন ব্যাটলফিল্ডের মনুমেণ্টের কাছে বসে সে বলেছিলো, এতো সহজভাবে কারুর কাছে আমার মনকে মেলে দিই নি, অমন সহজ হয়ে কোনো পুরুষের কাছে বসি নি। আজ চিঠি পাবার পর বুঝতে পারছি—তার সেদিনের ব্যবহারের মধ্যে নিবেদনের পবিত্রতা ছিলো। সেদিন আমিও বলেছিলাম, 'এমন করে কারুর দুঃখকে নিজের বলে মনে করেত পারি নি। আজ যেমন পারছি।' রমেন হাসলো। কেমন গম্ভীর সংযত হাসি।

কৌশিক অবাক হয়ে বার বার দেখলো রমেন রক্রবর্তীকে। একেবারে নতুন মানুষ। কারণে অকারণে যে গলা ফাটিয়ে হা হা করে হাসে, ছেলেদের সংগে মিশে খেলার মাঠে হৈ হৈ করে, যাত্রায় রাজার ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে দৃঢ়চেতা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে—সেই মানুষের আজ অদ্ভুত পরিবর্তন। বিয়ের নামে যে মানুষ আঁতকে ওঠে, সে এক নারীর আহ্বানে ছুটে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

রমেন আশ্চর্য গম্ভীর কণ্ঠে আবার বললো, রেখা আমাদের এই উদ্বোধনের কথা আপনাকে জানাতে বলেছে।

কৌশিক মাথা নীচু করলো কী ভেবে। চোখবুঁজে আস্তে আস্তে বললো' আপনাদের মিলিত যাত্রাপথ প্রাণপূর্ণ হোক। কৌশিক উঠে

দাঁড়িয়ে বললো, কবে ফিরছেন ?

রমেন চক্রবর্তী হাসলো। শান্ত গম্ভীর সংযত হাসি। বললো, যেদিনই ফিরি—রেখাকে সংগে নিয়েই ফিরবো। বিনু আর মা থাকলো। ওদের একটু দেখাশোনা করবেন। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো সে।—চললাম দাদা। দাসপাড়ার অবস্থাটা একবার দেখে যাই। গ্রামের অবস্থা সিরিয়াস্ হয়ে দাঁড়ালে হয়তো যাওয়া না-ও হতে পারে। সঁৎ সঁৎ করে নস্যি নিলো সে। তারপর ফুলপ্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে দাসপাড়ার দিকে রওনা হলো।

কৌশিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার বার বার মনে হলো, অনেক দুরাশা আর ব্যর্থতার মরু পার হয়ে এসে আজকের বৈরাগিণী পথিক রেখা দেবী খুঁজে পেয়েছে একটা নিরংকুশ নিশ্চিন্ততার দৃঢ় ভিত্তি। কৌশিক মনে মনে বললো, সেখান থেকে কেউ যেন রেখা দেবীকে একচুল বিচ্যুত করতে না পারে। কেউ না।

তার মনে পড়লো পিসিমার কথা সারা জীবন যিনি একটা অসত্যকে অতিক্রমের জন্যে স্থির হয়ে সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন, অবশেষে খুঁজে পেয়েছেন জীবনের ব্যথার সত্যকে।

বহুজনের প্রকম্প তীক্ষ্ণ আর্তনাদে চমকে উঠলো সে।—বাঁধ ভেঙে বিকট গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে একরাশ উন্মুক্ত জীবন্ত ক্ষুধা। মানুষের সমস্ত চেষ্টার উপর দিয়ে উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে ছুটে আসছে একটা দৈত্য করাল মূর্তি ধরে।

কয়েক মুহূর্ত পাথর হয়ে রইলো কৌশিক। চোখে তার অর্থহীন শূন্যতা।

বাঁধ ছিন্ন ভিন্ন করে শত সহস্র মুখে জল ঢুকছে গর্জন করে।

সবাই আপন আপন ঘরের দিকে ছুটলো। বাঁচার অন্য চেষ্টা এখন দেখতে হবে। সর্বনাশা দৈত্যের হাত থেকে প্রত্যেকেই বাঁচতে চায়।

কতক্ষণ কৌশিক নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তা খেয়াল নেই। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলো। পরেশ মণ্ডল ডাকছে, বাবু, আসুন।

দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ঘরে যান।

জল কৌশিকের হাঁটু ছাড়িয়ে গেছে।

সম্বিতকে কোলে নিয়ে বাইরের দরজার কাছে ভীত পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো নীলা।

কৌশিককে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো সে।

সম্বিত ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার বুকে। তুরন্ত উচ্ছল হয়ে উঠলো নিমিষেই।

—সেই কখন বেরিয়েছো তুমি! খাওয়া-দাওয়াও বুঝি হয় নি তোমার! নীলার কণ্ঠস্বর উদ্বেগ।—তোমার জন্যে স্কুলে যাওয়াও হলো না।

—আর পারা গেলো না। কৌশিক যেন হতাশ হয়ে সম্বিতকে নিয়েই চেয়ারে বসলো।—বেগে জল ঢুকছে। প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। জল এদিকেও আসবে।

—তুমি খেয়ে নাও তো। খেয়ে-দেয়ে যা করার করো। আজ আবার ঝি-টা আসে নি। মিনুদি অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে।

জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখলো কৌশিক। টাকা-পয়সা সোনা-দানা একটা ব্যাগের ভিতর পুরলো। প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। প্রয়োজন হলেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

খেতে বসলো কৌশিক। কিন্তু কয়েক গ্রাস মুখে তুলেই উঠে পড়লো।

বাইরের বারান্দায় এসে বসলো সে।

বাতাসে বিক্ষিপ্ত কলকোলাহল ভেসে আসছে। সে দেখতে পেলে—গোয়ালপাড়ার লোকেরা পোঁটলা-পুঁটলি গরু-বাছুর নিয়ে চলেছে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

ফুটফুটে জোৎস্নার আলোয় চারদিক ভরে আছে। তবু এদিকে ওদিকে হ্যারিকেনের ছোটাছুটি, টর্চের আলোর মুহূর্ত তীব্র ঝলকানি। বিক্ষিপ্ত আলোর সংগে প্রতিটি জীবনও দোল খাচ্ছে। টলছে জীবনের শক্ত সুগঠিত ভিত। জলের গর্জন শোনা যাচ্ছে। স্মৃষ্টি

করছে অস্থির পটভূমি। কৌশিকের মনে হচ্ছে, সে এক প্রত্যক্ষ সর্বনাশের সামনে বুঝি বসে আছে। তার কেন যে বার বার মনে হলো, তাকে পরীক্ষা করার জন্যে, তার জীবনকে বাজিয়ে নেবার জন্যেই বুঝি এই সর্বনাশার আগমন। আজ যদি প্রাণের দীপ্তিতে জ্বলে উঠে সংগ্রাম করতে না পারে তবে মাটি আর মানুষ তাকে ক্ষমা করতে পারবে না। কিন্তু সংগ্রামের রূপটা কী? কী ভাবে সে সংগ্রাম করবে? মাটি আর মানুষকে ভালোবাসতে পারলে সংগ্রামের ক্ষমতা অর্জন করা যায়—বাবার এ কথার অর্থ সে বুঝতে পেরেছে বলে মনে মনে গর্ব করেছিলো একদিন। কিন্তু উন্মুক্ত বিপর্যয়ের মধ্যে বসে তার কেবলি মনে হতে লাগলো, আঠারো বছর আগে এ কথার অর্থ যেমন অস্পষ্ট ছিলো, আজো তেমনি আছে।

ঘরের ভিতে জল এসে লেগেছে।

কখন যেন নীলা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

নীলা বললো, দেখছো—জল কেমন বাড়ছে। জলের গর্জনও যেন আগেয় চেয়ে বেশী। নীলার কণ্ঠস্বর কাঁপছে। একটু থেমে আবার বললো, রায় বাড়ির সবাই বিকেলে চলে গেছে।

কৌশিক কথা বললো না।

জোৎস্নার আলোয় আম-জাম-কাঁঠালের বনটা কেমন রহস্যঘন হয়ে উঠেছে। তালগাছটাকে কেমন নিঃসংগ মনে হচ্ছে। নিঃসংগ হলেও ওর মধ্যে বুঝি স্থৈর্য আর দৃঢ়তার অভাব নেই। একাই সে মাথা উঁচিয়ে থাকবে।

পুকুরটা জলে ভরে গেছে। এবার ক্ষ্যাপা বন্যার জল ওর রুদ্ধ জলরাশিকে ঠেলে বের করে দেবে। পুকুরের জল আর বন্যার জল মিশে একাকার হয়ে যাবে।

বহুদিন আগের জাগ্রত স্বপ্নটা ভাবস্থ কৌশিকের মনের মধ্যে ফিরে আসছে বুঝি। পুকুরের জলের গভীরে কৌশিকের ডুবে যাবার সাধ জেগেছিলো। একটা শব্দহীন গভীর চঞ্চলতার মধ্যে ডুবে যেতে চেয়েছিলো। নিঃসীম অবিশ্রাম চলার মধ্যে, একটা ক্লান্তিহীন

মৃত্যুত্তীর্ণ চঞ্চলতার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলো।...আজ বুঝি সেই পরম ক্ষণ উপস্থিত। বাঁধভাঙা জলের সংগে আজ পুকুরের জলের মিতালি। দিগন্ত প্রসারিত জলের মধ্যে ডুবে থাকার দিন কী সমাগত? নতুনভাবে উপলব্ধি, নতুন করে চলা, নতুন কিছু পাওয়ার মুহূর্ত অপেক্ষা করছে। এবার শুধু ঝাঁপিয়ে পড়া—উচ্ছাস হয়ে অশ্রান্ত চঞ্চলতার মধ্যে নিবিড় হয়ে নিজের মূল্যায়ন করা। অন্য কোনো বিচিত্রতর স্পন্দনে জীবনকে ভরিয়ে তোলা। আজকের জীবনের কূল পেরিয়ে অন্য কোনো ভূমিকায় নিজেকে জাগিয়ে তোলার সংকেত জলপ্রবাহের মধ্যে বুঝি অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে।

জ্যোৎস্নার আলোয় যতদূর দৃষ্টি যায়—কৌশিক তাকালো। মাঠ ঘাট প্রান্তর জলমগ্ন। জ্যোৎস্নার আলোয় রুপোর মতো ঝিকমিক করছে জলরাশি। বুঝি কৌশিককে আহ্বান জানাছে। যেন সীমাহীন সমুদ্রে ডুবে যাবার আহ্বান।

নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলা। দিশেহারার মতো দৃষ্টি। বুকটা মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। একটি প্রশ্নই তার মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে,—পৃথিবী কী রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে মানুষকে ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করে? পৃথিবী কী এমন নিষ্ঠুর? চারদিকে পূর্ণিমার আলো। তবু তার চোখে জমে চাপ চাপ অন্ধকার।

কৌশিকের সামনে তার এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে গম্ভীর কণ্ঠে নীলা বলে, পিসিমার মুখে একবার বন্যার গল্প শুনেছিলাম। নারীকল্যাণ সমিতির হয়ে তাঁরা রাজসাহীতে বন্যার্ত্তদের সেবা করতে গিয়েছিলেন। কতো বাড়ি-ঘর যে নষ্ট হয়েছিলো তার ইয়ত্তা নেই। অনেক মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় নি।

কৌশিক কোনো কথা বললো না। শুধু নীলার একখানা হাত তার বুকের উপর টেনে নিলো।

নীলা তার আর একখানা হাত রাখলো কৌশিকের কাঁধের পরে। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আজ শুধু পিসিমার কথা মনে পড়ছে।

পিসিমা থাকলে তুমি হয়তো এমন নিঃস্ব বোধ করতে না।

কৌশিক নীরবে নীলার হাতটা চেপে ধরলো বুকে। চুপি চুপি স্বরে বললো, তুমি তো আছো। তুমি কোনোদিনই আমাকে নিঃস্ব হতে দাও নি। আজকের দিনে একথা বলে আমাকে মিথ্যে দুঃখ দিও না নীলা। নীলার আর একখানা হাত ও বুকের উপর টেনে নিলো সে। মনে পড়লো কয়েকদিন আগে পিসিমার একখানা চিঠি এসেছে। পিসিমা অনেক কথা লিখেছেন। এক জায়গায় লিখেছেন: জীবনে অনেকের আশীর্বাদই তুই পেয়েছিস। তুই জানিস না তোর মধ্যে কী বিপুল শক্তি নিহিত। তবু যখনি যা-ই করিস—সুখে-দুঃখে, ধর্মে-কর্মে বৌমাকে সংগে রাখিস। বৌমার স্পর্শ তোকে নিত্য প্রেরণা দেবে, তৃপ্তি দেবে। বৌমা তোকে সবদা গতিময় সুখময় করে রাখবে।

কৌশিক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নীলাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো। নীলার মুখটা বুকে চেপে ওর মাথার উপর নিজের মুখটা রাখলো কৌশিক। কৌশিকের বুকের তপ্ত সান্নিধ্যে গলে মিশে যেন এতটুকু হয়ে যায় নীলা। মনে মনে বলে, শুধু এই অধিকারটুকু চিরদিন দিও। রূঢ় বাস্তবতার মাঝে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা দিতে তাহলে বিন্দুমাত্রও শংকিত হবো না। নিষ্ঠুর পৃথিবীর সমস্ত দান মাথায় পেতে নেবো।

আরো নিবিড় করে নীলাকে কাছে টেনে নেয় কৌশিক। আবেগভরে ডাকে—নীলা!

নীলা মুখ তোলে বলে, বলো।

কৌশিক কথা বলে না। নীলার কপালে তার মুখটা নেমে আসে ধীরে ধীরে।

নীলা স্পন্দিত কণ্ঠে বলে,—"এই গৌরবে চলিব এভবে যতোদিন দোঁহে বাঁচি"—

কৌশিক গাঢ় স্বরে বাকিটা পুরণ করলো,—এ রাণী প্রেয়সী হোক মহীয়সী,—তুমি আছো, আমি আছি।

জল ভেঙে টর্চের আলো ফেলে কারা যেন আসছে।

কৌশিকের বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে নীলা ঘরের মধ্যে চলে গেলো।

বারান্দায় এসে উঠলো বিনু এবং আর একটা ছেলে।

—তোমরা ? কী মনে করে ? কৌশিক কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

—এই এলুম। এক মুখ হেসে উত্তর দিলো বিনু।—এই ঝোলাটা আপনার এখানে রাখতে এলুম। অন্য কোথাও রাখতে ভর্সা পেলুম না। আমাদের ঘরের মধ্যে তো জল ঢুকেছে। দিদির বাগান নস্যাৎ।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো কৌশিক, তোমার মা ?

—আমাদের এইচ-এম মানে হেড মাষ্টারের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন। এইচ-এমের বাড়িতে ষ্টুডেন্ট হয়ে আমার থাকা চলে কিনা বলুন। আপনিই বলুন। কাঁধ থেকে একটা বড়ো ব্যাগ নামালো সে।

এত দুঃখেও কৌশিকের হাসি পেলো। বললো, বেশ করেছো। তবে এ বাড়িতেও টেকা যাবে না বলে মনে হচ্ছে। যে ভাবে জল বাড়ছে—। মাটির দেয়াল—

—কুছ পরোয়া নেই। বানের জল কী করবে ? কতোটুক করবে ? ব্যাগটা থাকলো। আমরা একটু ঘুরে আসি।

বারান্দা থেকে নামতে গিয়ে বিনু কী মনে করে থমকে দাঁড়ালো। তারপর ব্যাগ খুলে বের করলো ডুগি-তবলা। সপ্রতিভ হয়ে বললো, আজ একটুও বাজানো হয় নি। খানিকক্ষণ বাজিয়ে যাই। আপনারা ও অনেকদিন আমার বাজনা শোনেন নি। নীলাদি—নীলাদি! ডুগি-তবলা নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলো। অন্য ছেলেটাও ওর পিছনে পিছনে গেলো।

বারান্দার খুঁটি ধরে কৌশিক দাঁড়ালো।

জল দ্রুত বাড়ছে। কোথাও এতটুকু ডাঙা দেখা যাচ্ছে না। শুধু গাছ-পালা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। একটা রহস্যভরা সংকেত চারদিকে বিস্তৃত করে প্রকৃতি এক অদ্ভুত মূর্তিতে জেগে উঠেছে।

ঘরের মধ্যে বিনু তবলায় চাঁটি মারছে।

কৌশিক উৎকর্ণ হলো। ডুগি-তবলা যেন কথা বলছে বিনুর হাতে। দ্রুত অথচ গুরু-গম্ভীর তালে ডুগি-তবলা বাজছে।

বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কৌশিক। আজকের প্রকৃতির রূপের সাথে বাজনার কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাচ্ছে সে। প্রকৃতির অন্তরের কথা বুঝি ধ্বনিত হচ্ছে বাজনার মধ্যে। ডুগি-তবলার আশ্চর্য শব্দ ঘর ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। জলের গর্জনের সঙ্গে সেই আশ্চর্য শব্দটা মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কৌশিকের মনের মধ্যে মুহূর্তে জেগে উঠেছে এক গভীর চঞ্চলতার ধ্বনি। কৌশিক বারান্দার খুঁটি ধরে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লো। নতুনভাবে উপলব্ধি, নতুন করে চলা, নতুন কিছু পাওয়ার বাণী সে শুনছে। শুনছে অন্য পৃথিবীর সংবাদ।

কয়েক মুহূর্ত। ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেলো।

—নীলা, নীলা! কৌশিক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

নীলা দুরু দুরু পায়ে ছুটে এলো। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকালো কৌশিকের দিকে।

কৌশিক বলে উঠলো, আর দেরী নয়। এবার বেরোতে হবে।

নীলা নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। কী একটা বলতে চাইলো, পারলো না। শুধু বোবা দৃষ্টি মেলে ধরলো কৌশিকের দিকে।

—কই, বি রেডি। বি কুইক এ্যাণ্ড এ্যালার্ট। কৌশিক তাড়া দিলো।

নীলা হাসতে গেলো কিন্তু না পেরে কেমন এক ব্যথায় ফিরিয়ে নিলো মুখটা।

পাশের ঘরে তেমনি আশ্চর্য শব্দে ডুগি-তবলা বাজছে।

কৌশিক বিছানার দিকে তাকালো। সম্বিত ঘুমোচ্ছে। জানালা দিয়ে পূর্ণ চাঁদের এক ঝলক আলো এসে সম্বিতের মুখখানিকে ভরে দিয়েছে এক অপূর্ব সুষমায়। অসীম মমতায় আলতোভাবে সম্বিতের কপালে হাত রাখে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা

দিয়ে বাইরে তাকায়। মনে হয়, বাজনার আশ্চর্য তরংগাঘাতে সাড়াপ্রবণ আর বাংময় হয়ে উঠেছে জল-প্লাবিত জ্যোৎস্না-উচ্ছল প্রকৃতি।

বাজনা থেমে গেলো।

বিনু আর সেই ছেলেটা কৌশিকেয় সামনে এসে দাঁড়ালো।

কৌশিক এক আশ্চর্য হাসি হেসে বললো, এবার যাত্রা করতে হবে যে বিনু।

সপ্রতিভ মুখে বিনু বললো, যেতে যখন হবেই তখন দেরী করে লাভ কী! চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। কী নিতে ববে বলুন।

—এই সামান্য তুটো ব্যাগ—আমিই পারবো। তোমার ডুগি-তবলাটা তুমি নাও।

—আপনার এতো জিনিষপত্তর যখন থাকছে, তখন ডুগি-তবলাও থাকতে পারবে। আর যদি নষ্ট হয়—হোক্। আমি নষ্ট না হলেই হলো। হি হি করে হাসলো বিনু।

কাপড়টা এঁটে-সেঁটে পরেছে নীলা। ঘুমন্ত সন্বিতকে বুকের উপর তুলে নিলো।

ব্যাগ তুটো কাঁধে তুলে নিলো কৌশিক। একটা ব্যাগে টাকা-পয়সা, সোনাদানা আর সামান্য কিছু খাবার। অন্য ব্যাগটায় প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়।

দেয়ালে মা বাবা পিসিমা আর তাদের গুরুদেবের ফটো। কৌশিক নীরবে মাথা নীচু করলো।

নীলাও মাথা নীচু করে দেয়ালে মাথা ঠেকালো। মনে মনে বললো, শক্তি দাও।

কৌশিক বাইরের বারন্দায় এসে দাঁড়ালো। চোখে মুখে তার দৃঢ় দীপ্ত আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা।

চারদিক থেকে ভেসে আসছে কোলাহল। জলের গর্জন বেশ জোর। জল ধীরে ধীরে বাড়ছে, ফুলছে। বারন্দায় উঠবার চেষ্টা করছে। .....উন্মুক্ত সচকিত পরিবেশে এবার নিষ্ঠুর বাস্তবতার সাথে

সংগ্রাম। হবে জীবনের নতুন মূল্যায়ন; চলার নতুন সংজ্ঞা নির্ণয়। হয়তো একটা অভাবিত দিক। একটা নতুন পট। মানব জীবনের আশ্চর্য ভূমণ্ডল।

জল ভেঙে এগিয়ে চললো সবাই। সামনে বিনু আর সেই ছেলেটা। তারপরে কৌশিক। পিছনে সম্বিতকে কোলে করে নীলা।

হাত দিয়ে জলে শব্দ তুলে বিনু দ্রুত চলেছে। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো, সামনে গর্ত। একটু বাঁ দিক চেপে আসুন।

খুব সাবধানে সতর্কতার সংগে পা ফেলে এগিয়ে চললো কৌশিক আর নীলা।

জল কোমর ছাড়িয়ে গেছে।

—রেখা দেবী নতুন জীবন যাপন করতে যাচ্ছেন, শুনেছো? কৌশিক প্রশ্ন করলো।

—আজ বিকেলে রমেন বাবুর মুখে সব শুনেছি। সম্বিতকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো নীলা।

—সন্ধেবেলায় ওরা সত্যিই তাহলে ঠিকানা খুঁজে পেলো।

নীলা কোনো কথা বললো না। ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো।

সম্বিত চোখ বুঁজে মাকে আঁকড়ে ধরে আছে। শিশু-মন ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আজ একটা সাংঘাতিক কিছু যে ঘটেছে তা সে বুঝতে পেরেছে। তার পা দুটো জলে ভিজে যাচ্ছে। মায়ের বুকে সংকুচিত হয়ে আছে ছোট্ট শিশু।

বিনু আর সেই ছেলেটা সাঁতরে চলেছে। সাঁতরাতে সাঁতরাতে বিনু চেঁচিয়ে উঠলো, আমরা চললাম নীলাদি। আপনারা আসুন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেলো বিনু আর ছেলেটা।

নীলা বললো, পিসিমার চিঠিটার জবাব দেওয়া হলো না।

পিসিমা হয়তো খুব চিন্তায় থাকবেন। আচ্ছা, যশিডিতে পিসিমার ওখানে গেলে হয় না? হঠাৎ গিয়ে ওঁকে অবাক করে দেওয়া যাবে। সহজ হয়ে কথাগুলো বলবার চেষ্টা করলেও নীলার কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে উঠলো।

কৌশিক মনে মনে হাসলো। বললো, স্কুল ছেড়ে যাবে কেমন করে? পুজোর সময় বরং—

—কিন্তু বন্যা শুধু উদ্বাস্তু করে না, সবাইকে তাড়াবেও।

—তখনি প্রমাণিত হবে—লাইফ ইজ ইণ্টারন্যাল মুভমেণ্ট। বলেই উৎকর্ণ হলো কৌশিক। পিছনে তাকালো। বললো, তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? টুকুকে না হয় আমার কাছে দাও।

—না, আমিই পারবো।

এগিয়ে চললো দুজনে। কোনদিকে যে চলেছে তা বুঝতে পারছে না। দিক হারিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। অনেকক্ষণ আগে বাসা, তালগাছ, পুকুর, আম-জাম-কাঁঠালের বন পিছনে ফেলে এসেছে। কিন্তু এখনো পাকা সড়কের চিহ্নমাত্র নেই। কেদিকে চলেছে কী তারা?

বেশ কিছুদূরে কাদের কথাবার্তা। কারা তাদের মতোই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলেছে।

আজ সকালেও মানুষের জীবন নিরুদ্বিগ্ন ছিলো। কিষাণরা মাঠে বেরিয়ে পড়বার আয়োজনও করেছে। ভুরুলিয়া থেকে সেই ভিখারীটা এসে প্রতিদিনের মতো গান গেয়ে ভিক্ষে নিয়ে গেছে। কিন্তু এখন? একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ। খুশীর লেশমাত্র নেই। একটা আড়ষ্ট ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে স্বাভাবিক সরল জীবনপ্রবাহ।

কিন্তু কৌশিক ভাবছে, সব কিছুকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিয়ে আপন কর্তব্য, সম্মুখের দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই মানুষের সত্যিকার পরিচয়। প্রয়োজনে প্রদীপের মতো আলো ছড়াবে, প্রয়োজনে প্রদীপ্ত বিস্তারিত আগুনের মতো জ্বলে উঠবে। মনে পড়লো

পিসিমার চিঠির একটা কথা। তাঁর গুরুদেবের কথাটাই হয়তো তিনি লিখেছেন।—ধোঁয়া শুধু ছাদ-দেয়ালেই মলিন করে, নীলাকাশকে স্পর্শ করতেও পারে না। ধোঁয়ার কল্পনাতীত উর্ধ্বে সেই নীলাকাশ—প্রসন্ন ভাস্কর তার উপস্থিতি। কুশ তুই তো সেই আকাশ।

যত এগোচ্ছে, জল তত বেশী হচ্ছে। জলের গর্জন এবার জোর শোনা যাচ্ছে। পাকা সড়কেব পুল হয়তো কাছেই। পুল দিয়েই জল বোধ হয় এদিকে আসছে। স্রোতও পূর্বের চেয়ে এখানে একটু বেশী।

--ঝপ্—ঝপ্ঝপাং—ঝপ্—ঝপ্ঝুপ্! কোন অভাগার মাটির ঘর ধ্বসে পড়লো বোধ হয়। কাছেই কোনো গাছে কয়েকটা পাখির ডানার ঝট-পটানি শোনা গেলো।

হঠাৎ চমকে উঠলো কৌশিক। একটা ব্যাগ কখন যেন পড়ে গিয়েছে। দরকারী জামা-কাপড়ের ব্যাগটা পিছনে কোথায় পড়ে ভেসে গিয়েছে হয়তো। খোঁজাখুঁজি বৃথা।

পিছনে দৃষ্টি মেললো সে। নীলাকে তো দেখা যাচ্ছে না!

ডাকলো, নীলা—নীলা! ব্যাগটা বুকে চেপে ধরে আছে সে।

ক্ষণকাল স্তব্ধতা। কোনো উত্তর নেই।

দুরু দুরু বুকে ডাকে, কোথায় তুমি? নীলা—নীলিমা—!

এবারও কোনো উত্তর নেই। শুধু জলের গর্জন কানে বাজে।

যে পথে এসেছে, সেই পথেই কিছুদূর চললো সে। সর্বশক্তি সংহত করে চিৎকার করে ওঠে, নী—লা—নী—লি—মা!

অনতিদূর থেকে এবার নীলার অস্ফুট কাঁপা কাঁপা কথা ভেসে আসে, তুমি কো-থায়? এ······মি···

জল ভেঙে কৌশিক ছুটলো। কিছুদূর গিয়েই দেখলো জলের মধ্যে দাপাদাপি করছে নীলা।

পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো কৌশিক। হাত থেকে খসে পড়লো ব্যাগ।

কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো নীলার সামনে।—টুকু কোথায়! কৌশিকের উচ্চ কণ্ঠস্বর যেন চিরে গেলো। সর্বশরীর তার কাঁপছে। অসহায়ের মতো চারদিকে তাকালো সে। নীলার কাঁধ ধরে সজোরে ঝাঁকানি দিলো।—টুকু কোথায়? টুকু! কৌশিক যেন গর্জন করে উঠলো।

থর থর করে কাঁপছে নীলার সর্বাংগ। মাথাটা তার নুয়ে পড়েছে। নীলার কাঁধ ধরে আবার ঝাঁকানি দিলো কৌশিক।—সম্বিত কোথায়—!

কৌশিক উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। তোলপাড় করে ফেললো ঘোলা জল। ডুব দিলো। আবার উঠলো। আবার ডুব দিলো। আবার উঠলো। নেই—কোথাও নেই। ক্ষেতের ফসলের মতোই তাদের পবিত্র জীবন-ফসল গ্রাস করেছে এই করাল বন্যা।

নীলার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো কৌশিক। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে সে। অপলক দৃষ্টি ফেললো নীলার মুখে।

নীলা অসাড়। তার সমস্ত রক্ত পা বেয়ে শির শির করে নেমে যাচ্ছে। মৃতের মতো পাংশু মুখ। ভেঙে গেছে বিশ্বাসেগড়া আশাভরা নীড়। সব কিছু শূন্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। বর্তমান মর্মান্তিক। ভবিষ্যত নিকষ কালো কঠিন অন্ধকারে ঢাকা।

নীলার অসাড় দেহটা কৌশিকের বুকের মধ্যে এসে পড়লো। নীলাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো কৌশিক। শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করে আকাশের উজ্জ্বল রুপোলি চাঁদটার দিকে তাকিয়ে বললো,—চলো। শান্ত গম্ভীর এক আশ্চর্য কণ্ঠস্বর বাজলো।

—না—না—না, আমাকে ছেড়ে দাও তুমি। আমার টুকু—আমাকে টুকুকে···।

নীলার সমগ্র সত্তা এবার কান্না হয়ে ভেঙে পড়েছে।

নীলার হাত চেপে ধরলো কৌশিক! দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বললো, এসো। কৌশিকের কণ্ঠে যেন কঠিন আদেশের সুর বাজলো।

নীলা কান্নাভরা বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো আকাশের দিকে।

আকাশে চাঁদ। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। তবু কোথাও যেন এতটুকু আলো নেই। নীলা তাকালো উত্তাল বন্যার জলপ্রবাহের দিকে। কিন্তু সন্তানহারা মায়ের কাছে সমস্ত পৃথিবী যেন মরুভূমি হয়ে গেছে। জীবন শূন্য, জীবনের সমস্ত কিছু মিথ্যে হয়ে গেছে।

কৌশিকের পাশে পাশে একটা অর্থহীন শূন্যতার মধ্যে দিয়ে চললো নীলা। কৌশিকের ডান হাত তাকে বেষ্টন করে আছে।

চুপচাপ এগিয়ে চললো তুজনে। পিছনে পড়ে রইলো একটা অতলান্ত বেদনার সাগর—একটা অস্থির পটভূমি। পড়ে রইলো জীবনের প্রিয়তম ফসল।

প্রায় সাঁতার জলে এসে পড়লো তারা। স্রোতের টান এখানে বেশী। ধীর গম্ভীর স্বরে কৌশিক বললো, এবার সাঁতরাতে হবে নীলা।

নীলা কোনো কথা বললো না।

নীলার আঁচলের একপ্রান্ত ধরে কৌশিক বললো, তোমার আঁচল ধরে রইলাম। সাঁতরিয়ে আমার সংগে এসো। ভয় পেয়ো না যেন।

নীলার আঁচল ধরে ধীরে ধীরে সাঁতরাতে থাকে কৌশিক। পিছনে তাকায়। নীলাও সাঁতার দিচ্ছে।

জলের বিকট গর্জন শোনা যাচ্ছে। পুল কী তবে খুব কাছে? পুল দিয়ে জল আসার জন্যেই বুঝি এত শব্দ হচ্ছে। পাকা সড়কের কাছাকাছি এসে পড়েছে কী তারা?

জলের গর্জন যেদিক থেকে আসছে সেদিকে না গিয়ে একটু ঘুরে চললো কৌশিক।

পায়ের তলায় মাটি ঠেকছে এবার। কৌশিক দাঁড়ালো। হাঁফাচ্ছে সে।

পিছনে তাকাতেই ছ্যাঁৎ করে উঠলো তার বুকের ভিতরটা। নীলার শাড়িটা ধরে টান দিলো। নীলার পরণের কাপড়টা তার তুহাতের মুঠোর মধ্যে চলে এলো। নীলা নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত কোনো মানুষের চিহ্ন নেই।

কৌশিকের সারা দেহে কেমন একটা অবসন্নতা। দেহের সমস্ত রক্ত জমে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চাইছে। বুকের মধ্যে একটা নিঃস্ব কঠিন স্তব্ধতা।

তবু কৌশিক শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো। বারবার পলকহীন চোখে তাকালো চারদিকে। একপাশে কয়েকটা গাছ। চাপ চাপ অন্ধকার সেখানে। সেদিকে তাকিয়ে কৌশিক ডাক দিলো, নীলা! কৌশিকের কণ্ঠে এতটুকুও শক্তি নেই। কৌশিক আবার ডাক দিলো, নী-লা—! নী—লা—! কৌশিকের সেই বলিষ্ঠ দীপ্ত কণ্ঠ আর নেই। কেমন ক্ষীণ আর নিষ্প্রভ সেই কণ্ঠ।

জলের বিকট গর্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

কৌশিক গাছগুলোর দিকে গেলো। না, নীলা নেই।

আবার চারদিকে দৃষ্টি ফেললো সে। জলের উপর ঝিকিমিকি আর গাছের জমাট ছায়া ছাড়া আর কিছু কোথাও নেই। টকুর মতো নীলাও হারিয়ে গেছে। তাকে নিঃস্ব রিক্ত শূন্য করে কেবলি লোলুপ গর্জনে মুখর হয়ে উঠছে বন্যা। কত মানুষের সর্বস্ব গ্রাস করে নিজেকে বিস্তৃত করে চলেছে এই ভয়ংকর দৈত্যটা।

কৌশিকের সারা দেহ এলিয়ে পড়তে চাইছে কী জলের মধ্যে? পায়ের তলায় মাটি কী সরে যাচ্ছে? দুচোখে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হচ্ছে?

কয়েক মুহূর্ত কৌশিকের মধ্যে নিষ্প্রাণ নিশ্চলতা। তারপরেই তার কণ্ঠস্বর ঋজু বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো, নী—লা নী—লি—মা—! জলের গর্জনের উপর দিয়ে ভেসে গেলো কণ্ঠের আকুলতা।

জলের গর্জন কানের ভিতর দিয়ে শুধু তার মর্ম স্পর্শ করলো। কোনো প্রত্যুত্তর নেই। আর কোনো শব্দ নেই।

শাড়িটা একমুহূর্তের জন্যে বুকে আঁকড়ে ধরলো কৌশিক। তারপর ছেড়ে দিলো। যাক—ভেসে যাক। হারিয়ে যাক। স্ত্রী-পুত্রের মতোই মিলিয়ে যাক।

তীরবেগে সাঁতরিয়ে চললো কৌশিক। কোনো ভয় নেই।

কোনো দুঃখ নেই। বিন্দুমাত্র হতাশা বা অবসন্নতা নেই। নেই পিছনের কোনো টান, কোনো প্রয়োজন বিপুল সম্মুখে আজ নতুন ছুটি। জীবনের নতুন স্বাদ। নতুন রূপের সাম্রাজ্যে আজ তার নতুন করে উদ্বোধন।

সেই জাগ্রত মনের স্বপ্নটা আজ বুঝি সত্যিই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ডুবে যাবার গভীর আকাংক্ষাটি মিথ্যে হয় নি। আজ তার জীবনে চরম যন্ত্রণামুক্ত ক্লান্তিহীন চলা—একটা নিঃসীম চঞ্চলতা। বিপুল বেগে নতুন জগতে প্রবেশ করতে চলেছে সে। একটা অপূর্ব গতির রাগেই বুঝি স্পন্দিত হয়ে উঠেছে তার বহু দিনের প্রতীক্ষিত সত্তা। শিরা-উপশিরার মধ্যে বুঝি বিচিত্রতর স্পন্দন।

সাঁতরাতে সাঁতরাতে মনে মনে সে বলে, এমন কোনো চারণ কবি কী নেই যে তার মরমী গানে আজকের স্পন্দনভরা উদ্দীপ্ত মুহূর্ত-গুলোকে স্মরণীয় করে রাখে! এই গানের সুরই চিরকাল তার জীবনকে মুখর করে রাখতে পারে। শুধু তাকে কেন, যে কোনো মানুষের গোপন সত্তাকেও ঘা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারে, যে কোনো মানুষের কানে এক আশ্চর্য রাজ্যের ঠিকানা পৌঁছে দিতে পারে।

কৌশিক এগিয়ে চললো। যথার্থ সংগ্রাম আর চঞ্চলতার মধ্যে দিয়েই প্রতিমুহূর্তে এগিয়ে চলেছে সে—এমন বোধ করতে থাকে কৌসিক। জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন তার কাছে—আর বড়ো নয়। সংগ্রাম করাই বড়ো। আঘাত হানার মধ্যে প্রকৃত পৌরুষ, চরম আনন্দ।

তীর বেগে সাঁতরাতে থাকে সে। কিছুদূরেই পাকা সড়ক। গৃহহারা দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের কল-কোলাহল ভেসে আসছে।

পাকা সড়কের উপর বুক টান করে দাঁড়ালো কৌশিক। প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো। একবার নয়। বার বার।

সড়কের উপর হাজার হাজার মানুষ। গুঞ্জন, চীৎকার, কোলাহল, আর্তনাদ জোলো বাতাসকে ভারি করে তুলেছে।

জামা গেঞ্জী খুলে ফেললো সে। পরণের কাপড় চিপে চিপে জল ঝরালো কিছুক্ষণ। তাকালো আকাশের দিকে। চাঁদ হেলে

পড়েছে। জ্বলছে আকাশের তারা। আকাশের বুকে ওদের কেমন সতেজ উদ্ভাস। পৃথিবীর গ্লানিমা, বেদনার্ত কোলাহলের বহু বহু উর্ধ্বে ওদের অবস্থান।

গাছ-পালার মাঝে জোনাকির ছন্দময় আলো।

কৌশিকের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে বাবার মূর্তি। একটি আমৃত্যু চিরচঞ্চল মানুষের মূর্তি। তার পাশেই আর একটি প্রেমময়ী কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তি—সমগ্র সত্তা দিয়ে সংসার মাটি আকাশ গাছ-পালা ফুল-ফল আলো-বাতাসকে ভালোবাসতে চান যিনি।

কৌশিকের রক্তে কী একটা আশ্চর্য শিহরণ।

তার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে পিসিমার কথা রেখা দেবীর কথা। মনে পড়ছে নীলা আর সম্বিতের কথা। কেউ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কেউ দুঃখ স্বীকারের সাহস জুগিয়েছে, কেউ দিয়েছে প্রেরণা শক্তি, কেউ দিয়েছে দুহাতের অজস্র রিক্ততার সঙ্গে দুপায়ের অবারিত মুক্তি।

—এই যে বাবু, আপনি ভিজে কাপড়ে— ! পরেশ মণ্ডল কখন কৌশিকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।—আমার চাদরটা নিয়ে না হয় পরুন। আপনার ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে !

সত্যিই শীত-শীত বোধ করছে কৌশিক। হাত বাড়িয়ে চাদরটা নিয়ে পরলো।

কৌশিককে দেখে এগিয়ে এসেছেন হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এ অঞ্চলের অন্যতম ধনী ব্যক্তি, ফার্মের বড়ো অংশীদার। বিড়ির টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হতাশার সঙ্গে বললো, কী চরম সর্বনাশ হলো বলুন দেখি। কতো টাকা নষ্ট হলো। শালা বান দেখছি ভিখেরী করে ছাড়বে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন তিনি, —ভগবান, একবার মুখ তুলে চাও। আমাকে বাঁচাও ভগবান! অজানা ভগবানের উদ্দেশে যুক্তকরে প্রনাম জানালেন তিনি।

একটা বিড়ি ধরালেন হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, দেখি যাই। না দেখলে সবাই আবার চিন্তা করবে। একবার যাবেন। ঐ যে শিশু গাছটার কাছে দুটো ছই। ওখানেই

আছি। যাবেন, বুঝলেন? পরেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই, এখন একটু ওদিক যাতো!

পরেশ মণ্ডল ভ্রূভংগী করে চলে গেলো।

কৌশিকের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করলেন হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—সঙ্গে অনেক টাকা-পয়সা সোন-দানা আছে। খুব ভয় হচ্ছে। চারপাশে গিস্ গিস্ করছে ছোটো জাতরা। ওরা সব পারে—খুন জখম চুরি বাটপাড়ি। কণ্ঠস্বর একটু উঁচু করলেন তিনি।—দোতালায় নিশ্চিন্তে থাকতে পারলাম না। বানের জ্বালায় আর মানুষের ভয়ে একেবারে প্রাণান্ত হবার জোগাড়।

আর দাঁড়ালেন না হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেলেন।

ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে চাদর পরণে সড়ক ধরে এগিয়ে চললো কৌশিক। এগিয়ে চললো ছিন্নমূল মানুষের দিকে তাকাতে তাকাতে। মানুষের আজ চরম দুর্দশা। কেউ কাঁদছে। কারুর মাথা দু হাঁটুর মাঝে নুয়ে পড়েছে। কেউ কেঁপে উঠছে সশব্দ দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে। কেউ-বা স্তব্ধ পাষাণ হয়ে গেছে।

এই সব মানুষগুলো কী মর্মান্তিক অতীতকে মুছে ফেলবার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না? বর্তমানকে সহনীয় করতে পারে না?

সহসা থমকে দাঁড়ালো কৌশিক।...ধীরে ধীরে রক্তিম হয়ে ওঠে পুবের আকাশ। খোলা জলের উপর ছড়িয়ে পড়েছে রক্তিম আভা। কৌশিক মুগ্ধ চোখে দেখলো, সূর্য উঠছে—প্রশান্ত সমুদ্রের মধ্যে থেকে চিরপুরাতন সূর্যটা নতুন রূপে জাগছে। গম্ভীর শান্ত প্রসন্ন সূর্য। ধ্যান ভংগের পর যেন চোখ মেলছেন মহীয়ান ঋষি।

মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় কৌশিক। চোখে মুখে তার সতেজ উল্লাস। রক্তাভ নব সূর্যের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন একটা বলশালী আত্মপ্রত্যয়ের মূর্তি।

কৌশিকের মনে হচ্ছে—সারা জীবন ধরে এই সূর্যশিখা আর এই

পরম লগ্নের অপেক্ষাতেই বুঝি সে ছিলো।

—এই যে, আপনি! রমেন চক্রবর্তী কৌশিকের পাশে এসে দাঁড়ালো। কৌশিকের আপাদ মস্তক লক্ষ্য করলো বার বার। এক মুখ হেসে বললো, দাদার একেবারে সন্ন্যেসীর সাজ!

সাঁৎ সাঁৎ করে নস্যি নিলো রমেন। বললো, গ্রামের এই কন্‌ডিশান্ দেখে আর যেতে পারলাম না। এতোকাল যেখানে কাটালাম, সেখানকার বিপদের দিনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সেখান থেকে চলে যাবো এতো বড়ো সেল্‌ফিস্ আমি নই। বৌদি টুকু ওরা কোথায়?

—হুম্!

চমকে উঠলো কৌশিক আর রমেন দুজনেই। তাদের সামনে ভালুকের মুখোশ পরে কে একজন দাঁড়িয়ে।

—এতো বড়ো স্পর্ধা! কে রে তুই? রক্ত চক্ষু হেনে রমেন এগিয়ে গেলো মুখোশধারীর দিকে।

পরক্ষণেই দুজনে দেখলো, মুখোশটা হাতে নিয়ে হি হি করে হাসছে বিনু। হাসি থামিয়ে বললো, আপনাকে নয় মাষ্টারমশাই, কৌশিকদা আর নীলাদিকে ভয় দেখাতে এসেছি। মিট মিট করে হাসতে লাগলো বিনু।

রমেন কৌশিকের দিকে ফিরলো।—এবার বলুন এই ড্রেস কেন? কাপড়-চোপড় কী আনেন নি? কৌশিকের চোখে চোখ রাখলো সে।

কৌশিক উদাসীনের মতো হাসলো। ঠোঁটের কোণে হাসিটা ধরে রেখে বললো, মুখ যদি সত্যি হয় তবে মুখোশও সত্যি রমেনবাবু। রক্তবর্ণ সূর্যের দিকে তাকালো সে।

কৌশিকের কথার তাৎপর্য ধরতে পেরেলো না রমেন। স্তব্ধ হয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—বাইরের কোনো হেলপ্ আসছে কী? কৌশিক আশ্চর্য শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো।—নৌকো নিয়ে গ্রামে ঢুকে উদ্ধারের কাজ

চালানো দরকার।

—একবার অরুণবাবুর কাছে যাই দেখি। রমেন চক্রবর্তী দ্রুত পায়ে মানুষের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কৌশিকের মুখে রাঙা আলো এসে পড়েছে। উত্তাপ আর স্নিগ্ধতা নিয়ে বিপুল এক প্রাণের উৎসব লুটিয়ে পড়েছে তরে মুখের উপর। বাতাসে ফুর ফুর করে ওড়ে তার এলোমেলো চুল।

মানুষের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে সে।

রাস্তার পাশে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সোনালি আলো ঝরছে ঝির ঝির করে।

—বাবু! কৌশিকের সামনে এসে দাঁড়ালো চরণ বাগ্‌দী। তার চোখে মুখে রাজ্যের কালিমা। ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

—কী রে! কৌশিকের কণ্ঠে অন্তরংগতার সুর।

—ছাওয়াল, বউ মা কেউ নেই আমার। ঘর চাপা পইড়ে—। দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকলো চরণ।

—দূর বোকা! হেসে উঠলো কৌশিক।—আমার দিকে তাকা। আমি কী কাঁদছি? খালি হাতে আজ লড়াই করবার শক্তি ভরে নে। এই মাটির উপরেই তোকে, আমাকে, এই সমস্ত মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এমন জোয়ান হয়ে তুই কাঁদছিস? ছিঃ!

কৌশিকের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো চরণ বাগ্‌দী।

কৌশিক চরণের কাঁধে হাত রাখলো। তাকালো আকাশের দিকে।......সূর্যশিখার অবগাহনে উজ্জ্বল হয়ে ছুটে চলেছে চঞ্চল বলাকার দল।

শেষ